শারদীয়া ১৪১৭

সম্পাদক
সন্দীপ রায়

JPG To PDF Converter – **Unregistered**
If you want to remove this text, Please Register

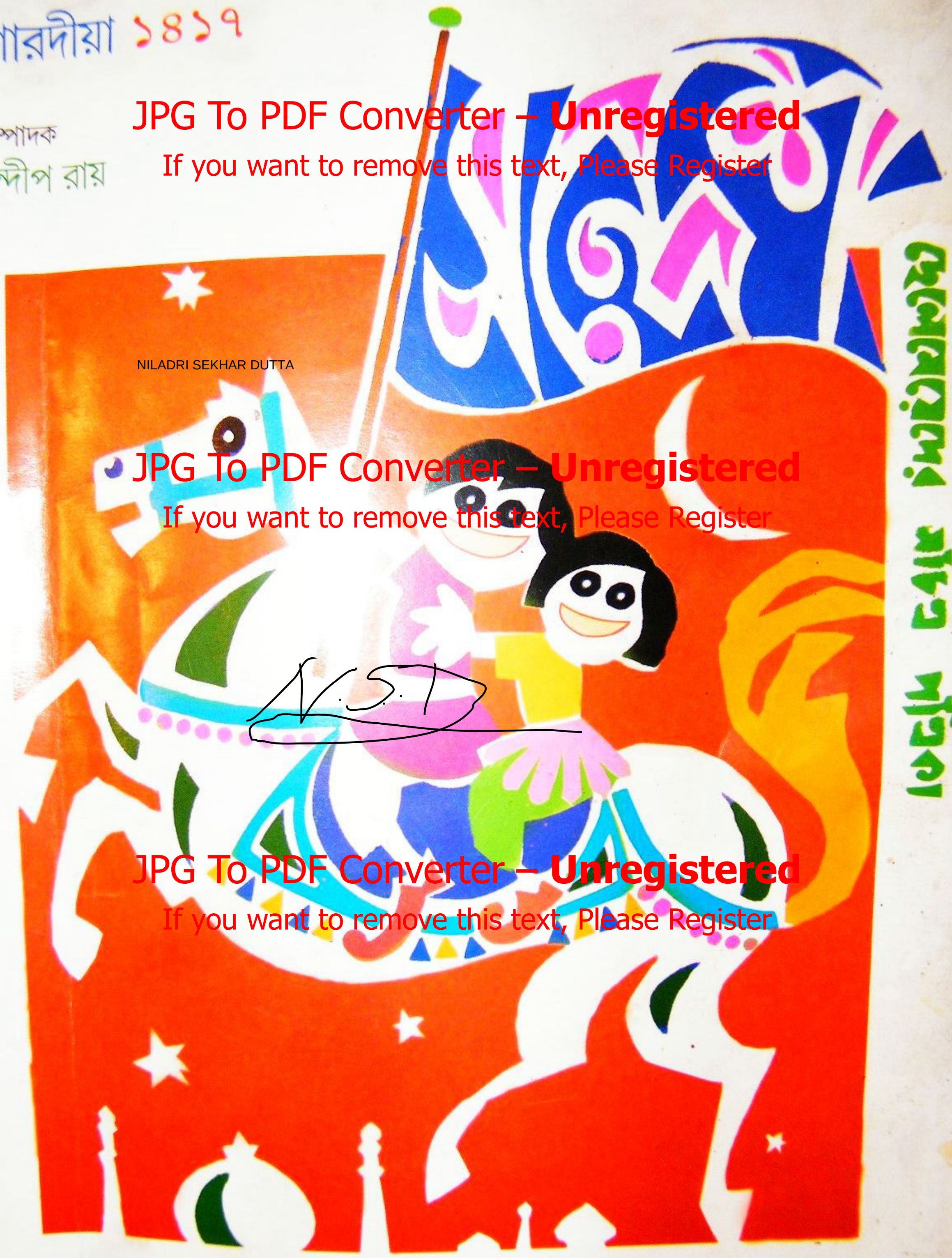

JPG To PDF Converter – **Unregistered**
If you want to remove this text, Please Register
JPG To PDF Converter – **Unregistered**
If you want to remove this text, Please Register

উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার, সত্যজিতের ছোটদের সেরা পত্রিকা

সন্দেশ

JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register

শারদীয়া সংখ্যা

তৃতীয় পর্যায় ● বর্ষ ৫০
সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০১০ ● ভাদ্র-অগ্রহায়ণ ১৪১৭

উপন্যাস

ভিন্ডিশ/ধীরা পালিত ২৫
থ্রোশীয় ছোরা/হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত ৫৫
আকাশকুসুমপুরের ডায়েরি/[illegible] ৬০

গল্প

সেই ন্যাদোশ/মহাশ্বেতা দেবী ১০
দিলীপ সুদক্ষিণার পুত্রলাভ/গৌরী ধর্মপাল ১৩
ইঁদুরভায়ার বিয়ে/নবনীতা দেবসেন ২১
হারুর হিট/প্রণব মুখোপাধ্যায় ৩৭
শরৎ টিকটিকির ঝাঁটা/দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য ৪১
বুনো হাঁসের খোঁজে/হীরেন চট্টোপাধ্যায় ৪৯
টুনটুনির গল্পের দেশ/[illegible] ৬১
বিক্রমের বিক্রম/মঞ্জিল সেন ৭৩
পালাও টুকাই পালাও/দীপঙ্কর বিশ্বাস ৮২
সেয়ানে সেয়ানে/স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৪
বিজুমামা ও বাঘমামা/সুনীল জানা ১০০
হারানো উইল/আগাথা ক্রিস্টি
অনুবাদ পবিত্র সরকার ১১৪
স্মৃতির বাগান/চম্পক সৌরভ ১২১
দশ বছর পরে/তিলোত্তমা মজুমদার ১২৩
তারার মালা/তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৯
অশরীরী [illegible] ১৬৬
[illegible] ১৭৮
পাহাড়চুড়োর বনফুল/অরণিমা রায়চৌধুরী ১৮৬
তারামণির হলুদ ময়না/শিবানী রায়চৌধুরী ২২২
উড়ুক্কু ছাগল/রমেন গাঙ্গুলী ২৩১
ভেজা মাটির গন্ধ/শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য ২৩৭
পাগলাবাবা দাঁতের মাজন/শোভন শেঠ ২৫০
এক অতিথির স্মৃতি/লায়লী দাশ ২৭২
ডিম/শুভশ্রী ভট্টাচার্য ২৭৭

প্রবন্ধ ও আলোচনা

সব হতে আপন/অমিতাভ চৌধুরী ২৩
'শুভময়ী মাতৃসমা বিজ্ঞানী' হজকিন
/আশীষ লাহিড়ী ৮৯
'গুপী' আর নেই/উপাধ্যায় উবাচ ১২০
কল্পনা, সত্য ও গোঁজামিল/জয়ন্ত ভট্টাচার্য ১৬২
একশো বছরে বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর
/শ্যামল চক্রবর্তী ১৭১

JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register
JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register
JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register

কার্টুনিস্ট লক্ষ্মণ/দেবাশীষ দেব ২১৯

একশোয় চিরায়ত টুনটুনি /পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ২২৮

মৌমাছি, আনন্দমেলা ও মণিমেলা সংগঠন /সবিতেন্দ্রনাথ রায় ২৩৪

জানা অজানা শিবরাম/কিন্নর রায় ২৩৬

জীবজন্তুদের রাসায়নিক অস্ত্র /বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ২৪৭

কার্টুনিস্ট সুফি/বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায় ২৫৩

পরিবেশ জল/অমিতানন্দ দাশ ২৫৭

স্মৃতির আলোয় সন্দেশের নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়/বিনীতা ঘোষ ২৬৪

সন্দেশের প্রসাদ রায়, সন্দেশের ময়ূখ চৌধুরী/দেবাশিস সেন ২৬৭

বসাকদীঘি থেকে কর্ণপরিচয় /শ্রীকাঙ্কেশ্বর কুচকুচে ২৭৫

এরই লাগি মধুকর/রুচিরা সেন ২৭৯

আমার মেজো পিসি/সুনন্দা রায়চৌধুরী ২৮১

শার্লকের ভূমিকায় যারা/অমিত দাস ২৮৩

ছড়া ও কবিতা

তখন কলকাতা/নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৯

বিশ্বকাপের ছড়া/রঞ্জনপ্রসাদ ১২

অভিমান/শঙ্খ ঘোষ ২০

ধাধাধা/শ্যামলকান্তি দাশ ৪০

ফুলকথা/সায়ন্তনী নাগ ৪০

টুনটুনি/কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০

সবার আলোর আল্পনাতে /ভবানীপ্রসাদ মজুমদার ৪৮

ঘাড় নাড়া সেই বুড়ো/সরল দে ৭২

দাদুর খড়ম/অপূর্ব দত্ত ৭২

সন্দেশ ৫০/রাকা দাশগুপ্ত ৮৮

জন্মদিনের উপহার/পিনাকী ঠাকুর ৮৮

জলছবি/রূপক চট্টরাজ ১৩০

স্বপন মুলুক/দীপ মুখোপাধ্যায় ১৩০

হারানো তারার খোঁজে/মধুসূদন ঘাটী ১৯৩

নীলপদ্মের পাড়া/আরণ্যক বসু ১৯৩

মায়ের মুখ/সুখেন্দু মজুমদার ২৪৬

আঁকার [illegible] ২৪৬

কী অপরূপ পাঠ্যসূচী/বিশ্বনাথ গড়াই ২৫৬

সঙ্গী দুপুর/অপূর্বকুমার কুন্ডু ২৫৬

খিদে/রজতশুভ্র মজুমদার ২৬৪

কী সুখ কী সুখ ধরিত্রীতে/মৃদুল দাশগুপ্ত ২৬৬

নাটক

তোতাকাহিনীর পরে/সৌমিত্র বসু ১৩৪

খেলা

একাই আটশো মুরলী/শিবাজী চক্রবর্তী ৭৯

আলেজাদ্রার জন্য সোনার বল /সুরজিৎ সেনগুপ্ত ১৩১

পি কে ব্যানার্জীর সঙ্গে একটি সকাল /প্রণব মুখোপাধ্যায় ও সুগত রায় ১৮৯

কার্টুন ও কমিক্স

কার্টুন/অমল ১০৫

দুঃখী রাজা সুখী সে/নীতিশ মুখোপাধ্যায় ১৪১

ঢাউস/কাহিনী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় -ছবি সৌকর্য্য ঘোষাল ১৪৭

ভ্রমণ

জারোয়াদের দেশে/[illegible] কুমার ঘোষ ১০৭

প্রকৃতি পাতুয়ার দপ্তর

দুস্তর মরুর পথে দুদিন/জীবন সর্দার ২৮৫

পাদপূরণ

বাড়াবাড়ি/প্রবাল সেন ১২২, ১২৯, ১৪০, ১৪৫, ১৮৫, ১৯২, ২৩০, ২৪৫, ২৫২

JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register

ছবি এঁকেছেন

সত্যজিৎ রায়, আর. কে. লক্ষ্মণ, ময়ূখ চৌধুরী, সুফি, অমল, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য, সুদীপ্ত দত্ত, পার্থ দাশ, কৃষ্ণেন্দু চাকী, অনিন্দ্য বসু, সৌকর্য্য ঘোষাল, রাহুল মজুমদার

প্রচ্ছদ

সত্যজিৎ রায়

সম্পাদক

সন্দীপ রায়

সহ-সম্পাদক

প্রণব মুখোপাধ্যায়

৬০ টাকা

সন্দেশ কার্যালয় ১৭২/৩, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০২৯ থেকে সন্দীপ রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও

কালী প্রিন্টার্স এন্ড বাইন্ডার্স ১০৯বি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯ কর্তৃক মুদ্রিত

স্বত্বাধিকারী [illegible]

JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register

FALTA
SPECIAL ECONOMIC ZONE

*Approved by Govt. of India in 1984.
*Declared a Customs Bonded Area - 16.8.85
*Gross area 280 acres
*SDF 18870 sq.m.(2nos.) Built - up space
*15350sq.mtr.(7 nos) Industrial shed
*11 kms Internal road
*About 1million liters per day water supply -capacity with drainage facilities
*Uninterrupted Power supply with a waiver of Electricity Duty for a period of 5 Years.
*Electronic Weigh bridge
*Duty free Enclave
*State-of-art Infrastructure
*In house Customs Facilities
*Manufacturing & Service activity
*Export-Import on Self-Certification basis
*Exemption of Income-Tax
*Exemption from CST, VAT & Service Tax
*Exemption of Duty on Construction Materials

To know more please contact-

Falta Special Economic Zone
Ministry of Commerce & Industry,Government of India
2nd, MSO Building (4 th Floor),Nizam Palace,
234/4 AJC Bose Road, Kolkata - 700 020
Tel: 033-2287-2263/2287-4092 Fax: 033-2287-3362
Website :www.fsez.nic.in, e-mail : fsez@nic.in

fsez

JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register

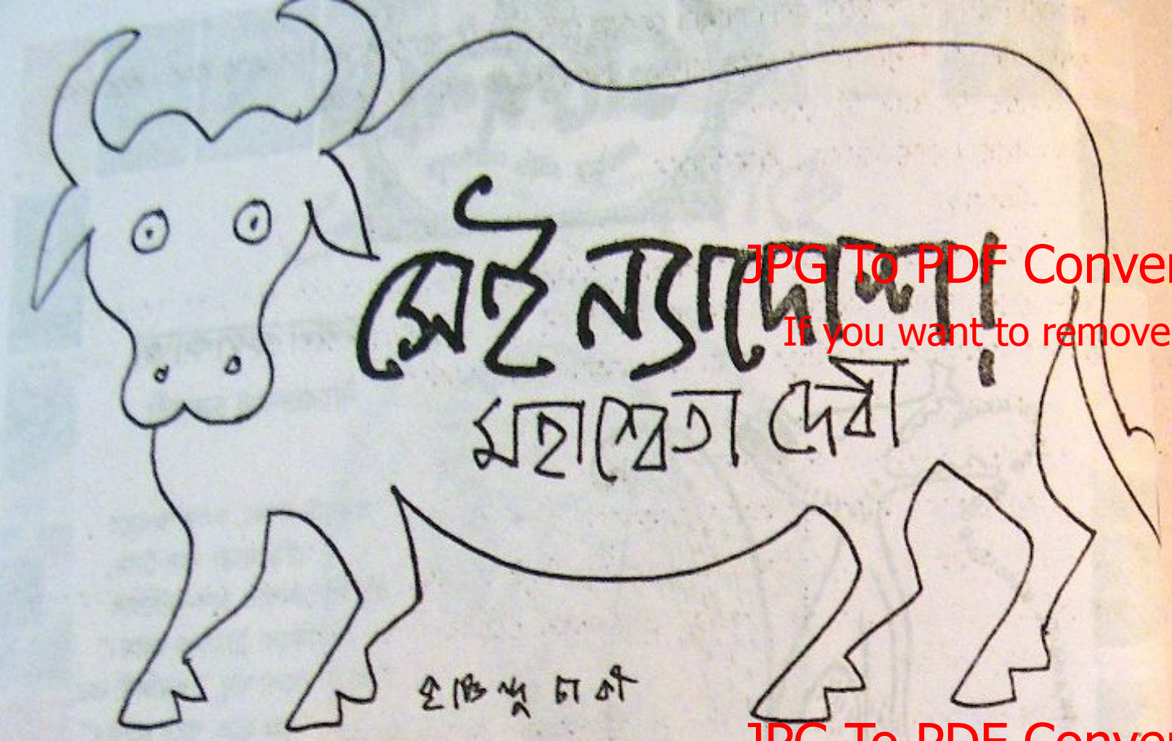

JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register

এখন যারা 'সন্দেশ' পড়ো, তারা জানোই না, যখন সত্যজিৎ রায় 'সন্দেশ' হাতে নিলেন। তাঁর অনুরোধেই সেবা করার সংখ্যায় 'ন্যাদোশ' লিখেছিলাম। এক সময়ে আমার মা বহরমপুরে গরু পোষা শুরু করেন। আমাদের বাড়ি তো! আমাদের বাড়ির গরু বলো, মুরগি বলো, সকলেই মুক্তমনে স্বাধনভাবে চিন্তা করত, আচরণও ছিল সে রকম।

যেমন অতীব মিলিট্যান্ট মুরগি দলি বুড়ি ডিম পাড়ত বাবার জুতোর মধ্যে। তাঁর কোটের পকেটে, আমার বোনদের ড্রেসিং টেবিলের দেরাজে।

আর ন্যাদোশ, আমাদের গরু, সে বর্ষার দিনে (ওখানে বর্ষা সময়ে ৩-৪ দিন ধরেও হতে) মাছ মাংস মাথা এঁটো কলাপাতা খেয়ে বিদ্রোহী হয়ে গেল। নিয়মিত মাছের লোভে রান্নাঘরেও ঢুকে যেত। সে 'গরু শাস্ত্র বিরোধী' সব কাজই করত। 'সন্দেশ' কাগজ যখন আবার বেরোল, সম্পাদকের অনুরোধেই গল্প লিখতে শুরু করি, এ ভাবেই ন্যাদোশের বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব।

স্বভাবতই যখন তার গল্প লিখছি, ততদিনে ন্যাদোশ গো—লোকে গেছে। হে গো—লোক, গোলক নয়, যে গোলক ধামের কথা গানে-কীর্তনে-ভজনে শোনা যায়। এটা গরুদের স্বর্গ, তাই গো-লোক!

আমার ন্যাদোশের গল্পে ন্যাদোশ গো-লোক থেকেই আসে এবং ন্যাদোশোচিত বক্তব্য রেখে যায়। এ গল্পতেও তাই ঘটবে। কেননা, যতদিন পারব, ন্যাদোশের গল্পই লিখে চলব।

এবার বৃষ্টি ঝমঝমিয়ে হবার কথা, হচ্ছে না। তা নিয়ে মনে অনেক চিন্তা। কেননা জানলার বাইরে চাইলে অনেক গাছপালা, ঝোপঝাড় দেখতে পাই। ন্যাদোশের কথাও মনে যথারীতি ন্যাদোশ সামনের জানলা দিয়ে ভেসে চলে এল। আমার লেখার টেবিল, আর সামনের জানলার মধ্যে আরাম করে বসল। বলল, কি গো! সুকো তো এসে যাচ্ছে। এবার আমার গল্প লিখবে না?

—এতদিন আস নি কেন?

—আহা! ব্যস্ত ছিলাম! ব্যস্ত ছিলাম!

—কিসে?

—[illegible] চাই! আমিও তা কেনে...যাকে বলে খাপ চুরিয়াস হয়ে গেলাম! [illegible] লোকে, অর্থাৎ আমাদের লোকে, সব গরুই তো পৌঁছয়....তাদের বোঝালাম। সব কিছু ওরা করবে? আমরা গরুরা কিছুই করব না! একটা 'কল' দিলাম।

—কাকে?

—কেন? গরুদের? স্বর্গে গরু কম আছে?

—স্বর্গে গরু? ন্যাদোশ! কাকে বোক না!

ন্যাদোশ বজ্র কণ্ঠে গলা খাঁখাড়ি দিল। বলল, কিছুই জানোনা! বৃন্দাবন থেকে কৃষ্ণর গরুগুলো পালে পালে এসেছে না? এত গরু পেলাম যখন, তখন তোমার খাবার নিলাম।

—কার কাছে?

—আহা! মর্ত্যের সঙ্গেও যোগাযোগ তো থাকে! তেমন একজনই জানাল.....যে তোমরা না কি বিদ্রোহী হয়েছো? সবদা বলছ, 'পরিবর্তন চাই!' কি! ঘাবড়ে গেলে?

—ভাবছি, তোমার মতো.....

—বজ্জাত গরু আর দেখ নি।

—না।

—দেখবে কি করে? আরেকটা ন্যাদোশ করেছে?

—তোমারও যাকে বলে.....

—বিদ্রোহী হয়েছি।

—কি করছ?

—আমি যা বলছি, ওরাও তাই করছে।

—সেটা কি?

—[illegible]পি বলো। ফুলকপি বলো, সব ওঠাচ্ছি আর খাচ্ছি।

—[illegible]

—হয় না? হল্যাণ্ডের গরু! আমাদের হারিয়ানার গাই! সকলের খাওয়ার যুগ্যি সবকি চাষ হয়।

—এটাই বিদ্রোহ?

—সবে তো শুরু হয়েছে। দেখ! পরিবর্তনকামী গরুরা কি কাণ্ডটা করে! ভেবো না, খবর পাবে।

ব্যস, নিমেষে ন্যাদোশ হাওয়া! ভাবলাম, জিগ্যেস করব, স্বর্গেও কি মাছ মাংস খাও? সময় পেলাম না।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register

দিলীপ-সুদক্ষিণার পুত্রলাভ

গৌরী ধর্মপাল

সরযূ নদীর তীরে উত্তরকোসল নামে এক রাজ্য। সেই রাজ্যে রাজত্ব করতেন এক রাজা। তাঁর নাম দিলীপ। দিলীপ রাজার যেমন রূপ, তেমন গুণ, তেমন বিদ্যে, তেমন তেজ। আর বুদ্ধি? সেই বুদ্ধি দিয়েইতো রাজ্য শাসন করতেন। যেমন [illegible] কড়া শাসন। প্রজারা ভয়ও করত আবার ভালও বাসত। তাদের শিক্ষা বল, রক্ষা বল, ভরণপোষণ বল, সব তিনিই করতেন, করাতেন। তিনিই যেন আসল বাবা। জনকরা নয়।

তাঁর রানী ছিলেন মগধের রাজকুমারী সুদক্ষিণা। সুদক্ষিণা তো সুদক্ষিণাই। বড়ই ভদ্র, বড়ই স্নেহময়ী, বড়ই উদার। আর দিলীপ অন্ত প্রাণ। দুজনে দুজনকে এত ভালবাসেন, কিন্তু তাঁদের কোনো সন্তান নেই। এত সুখ সমৃদ্ধি আনন্দের মধ্যে সেই দুঃখটি মনের মধ্যে কাঁটার মত খচ্ খচ্ করে।

আশায় আশায় অনেকদিন কাটল। তারপর একদিন রাজা বল্লেন রানীকে—রানী, ছেলে কি মুখের কথা? ছেলে পাবার জন্য কত ব্রত নিয়ম জপ তপ করতে হয়, আমরা তো সেসব কিছুই করিনি। চলো, গুরু বশিষ্ঠের আশ্রমে যাই। তিনি নিশ্চয় একটা উপায় বলে দেবেন। (বসিষ্ঠ মানে উজ্জ্বলতম, বশিষ্ঠ মানে সংযমীদের শ্রেষ্ঠ)।

রানী বললেন, তাই যাই চলো।

রাজা-রানী গুরুর আশ্রমে যাবেন, রাজপুরীতে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। কিন্তু রাজা বললেন, না, বেশী লোক যাবে না। হৈ হৈ হবে। আশ্রমের শান্তি নষ্ট হবে।—

ভালোবাসে যা [illegible] পাখ-পাখালি
এ-ফাঁকে পাতাতে চায় বন-মিতালি
সাদাসিধে খাবা-দাবা আর চুপচাপ
তারা শুধু যাক।

মন্ত্রীদের হাতে রাজ্যভার দিয়ে, শুচিশুদ্ধ হয়ে, ব্রহ্মা-ঠাকুরের পুজো দিয়ে রাজা-রানী রথে উঠলেন। কি তার স্নিগ্ধ গম্ভীর আবাজ, যেন গুরু গুরু ডাকছে বর্ষার মেঘ। তার ওপর রাজা যেন মেঘ? না হাতি? মেঘের হাতি, প্রকাণ্ড সেই ঐরাবত। পাশে রূপসী রানী বিদ্যুতের মতো ঝলমল ঝলমল করছেন।

রথ চলেছে। কখনো বুনো, কখনো মেঠো, কখনো গেঁয়ো পথ ধরে। রাজপ্রাসাদের সোনার খাঁচা ছেড়ে বাইরে খোলামেলায় এসে রাজারানীর কি ভালই যে লাগছে। পথের দুধারে কত যে গাছ [illegible] রয়েছে কত রকম [illegible] ফুলের রেণু ছড়িয়ে, শালের আঠার ভুরভুরে গন্ধ মেখে বাতাস বইছে [illegible] মনে করে, মুখ বাড়িয়ে ময়ূরেরা ডেকে উঠছে ক্যাঁ....ও.....ক্যাঁ.....ও। হরিণেরা ছুটে এসে জোড়ায় জোড়ায় দাঁড়িয়ে রথ দেখছে। রাজা বলছেন, সুদক্ষিণা, দেখ দেখ, ঠিক তোমার মতো চোখ। সুদক্ষিণা বলছেন, উঁহু, তোমার মতো। হঠাৎ পাখির ডাক। রাজারাণী চমকে মুখ তুলে দেখেন, একদল সারস মালার মতো দুলতে দুলতে উড়ে যাচ্ছে। পুকুরে পুকুরে ফুটেছে পদ্মফুল, তার ঠাণ্ডা মৃদু সুবাস ভেসে আসছে হাওয়ায়। মাঝে মধ্যে দেবোত্তর গ্রাম। সেখানে থাকেন ব্রাহ্মণেরা। যাগ-যজ্ঞ করেন। পড়াশোনা করেন, করান। টাকার [illegible] হয় না। নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে স্বচ্ছন্দে থাকেন। রাজার রথ যাবে শুনে তাঁরা আসছেন প্রাণ ভরে তাঁদের রাজা-রানীকে আশীর্বাদ করতে। তাঁর রথ থামিয়ে মাথা নিচু করে নিচ্ছেন তাঁদের আশীর্বাদ। নিতে গিয়ে তাদের এক খুকুর মুখে হঠাৎ এসে পড়ল রানীর ঝকমকে ওড়নাটি। রানী হেসে তাকে চুমু খেলেন।

গয়লাগাঁও থেকে মাতব্বররা আসছেন রাজারানীর জন্যে টাটকা ননী-মাখন নিয়ে। তাঁদের তাঁরা শুধিয়ে নিচ্ছেন পথের ধারের নাম না-জানা গাছ-গাছালির নামগুলো। পরনে উজ্জ্বল বেশ, চোখে মুখে ছুটির খুশি—কি সুন্দর যে লাগছিল তাঁদের দেখতে। ঠিক যেন শীতের কুয়াশা কাটা বসন্তের আকাশে ফুটে উঠেছে চাঁদখানি [illegible] চিত্রা তারাটি।

রানীকে কত কি দেখাতে দেখাতে চললেন রাজা। কোথা দিয়ে যে পথ ফুরিয়ে বিকেল হয়ে সূর্যি পটে নামল, টেরও পেলেন না। সন্দে হব-হব সেই সময় ঘোড়ারা হাঁপাতে হাঁপাতে রথ নিয়ে ঢুকল তপোবনের চৌহদ্দি তে। চারিদিক তাকিয়ে রাজারানীর চোখ জুড়িয়ে গেল। বন থেকে দলে দলে ফিরছেন তপস্বীরা কাঠ, কুশ, ফলমূল নিয়ে। পাতার কুঁড়েগুলির দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে গেছে হরিণেরা ঋষিপত্নীদের হাত থেকে উড়কি ধানের ভাগটি নিতে, ঠিক যেন টিফিন খেতে ভিড় করেছে বাচ্চার দল। মেয়েরা গাছে জল দিয়েই তক্ষুনি সরে যাচ্ছে, আর পাখিগুলো নির্ভয়ে গাছের গোড়ায় ছোট্ট

JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register

গোলপুকুরে জমা সেই জল চুক চুক করে খাচ্ছে। যজ্ঞের আগুন জ্বালানো হয়েছে, পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে ধোঁয়া। কি সুন্দর আহুতির গন্ধ ছড়িয়েছে চারদিকে। রাজা রথ থেকে নামলেন, রানীকে হাত ধরে নামালেন। সারথিকে বললেন, ঘোড়াদের বিশ্রাম করাও। তারপর ঢুকলেন আশ্রমে। মুনিররা সাদরে স্বাগত জানালেন রাজারানীকে। তারপর এত সুন্দর করে আপ্যায়ন করলেন যে রথের ঝাঁকুনিতে তাঁদের যে ধকল হয়েছিল, সব যেন জুড়িয়ে গেল।

গুরু বসিষ্ঠ বসে আছেন মা অরুন্ধতীর সঙ্গে। যেন অগ্নির সঙ্গে তাঁর পত্নী স্বাহা। কী তেজস্বী গম্ভীর শান্ত সমাহিত মূর্তি ঠাকুরের। অবশ্য রাজাও কম যান না। বসিষ্ঠ-ঠাকুরের আশ্রমই হল তাঁর রাজ্য। আর রাজার রাজ্যই হল তাঁর আশ্রম। মুনি ঋষির মতনই শান্ত সংযত হয়ে থাকতে হয় রাজাকে। চতুর্দিকে আগাপাশতলা শ্রম করতে করতে করতেই গড়ে ওঠে একটি সুন্দর রাজ্য। বসিষ্ঠ তা জানেন। তাই রাজারানী প্রণাম করতে স্নেহ-ক্ষরা চোখে তাঁদের অভিনন্দিত করে বললেন, রাজর্ষি, আপনার রাজ্য-আশ্রমটির কুশল তো?

দিলীপ বললেন, ঠাকুর, আপনি যখন রয়েছেন আমার রাজ্যের ভার নিয়ে, তখন কি কুশল না হয়ে পারে? আপনার তপস্যাবলে আমার প্রজারা সুখেই আছে। কেউ অকালে মরে না। রাজ্যে অনাবৃষ্টি নেই। অতিবৃষ্টি নেই। পঙ্গপাল নেই। বৃষ্টি হয় যথাসময়ে। শস্য হয় প্রচুর। শত্রুর আক্রমণও নেই। আপনি দূরদর্শী ভূয়োদর্শী ঋষি, আপনার মন্ত্র-মন্ত্রণার ফলেই শত্রু এরাজ্যে আসতে ভয় পায়। আমায় ধনুক ধরতেই হয় না। সবই ভালো। কিন্তু ঠাকুর, আপনার এই বৌমার এখনো পর্যন্ত সন্তান হল না। তাই এমন সোনার রাজ্যও আমার আর ভালো লাগছে না। কি করলে ছেলে পাব, বলে দিন ঠাকুর।

রাজার কথা শুনে ঋষির চোখ দুটি স্থির হয়ে গেল। তাঁকে দেখাতে লাগল যেন একটি শান্ত ঝিলের মতো—একটি মাছও নড়ছে না, সব ঘুমিয়ে পড়েছে। গভীর ধ্যানের মধ্যে ঋষি দেখতে পেলেন অনেক বছর আগেকার একটি ঘটনা। ঋষি বললেন—

রাজা, একবার স্বর্গে ইন্দ্রের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে তুমি পৃথিবীতে ফিরে আসছিলে। পথে কল্পতরুর ছায়ায় শুয়েছিলেন স্বর্গের কামধেনু সুরভি। সুদক্ষিণার জন্যে তখন তোমার এমন মন কেমন করছিল, যে ফেরার তাড়ায় তুমি সুরভিকে প্রদক্ষিণ করলে না। তখন তিনি তোমায় শাপ দিলেন, 'তুমি যেমন আমায় অবজ্ঞা করলে, তেমনি আমার সন্তানকে সেবা না করলে তোমার সন্তান হবে না।' রাজা, সে শাপ তুমি শুনতে পেলে না, তোমার সারথিও না, কেননা দিগ্‌গজেরা তখন আকাশগঙ্গায় নেমে ঝাঁপাই জুড়তে লেগেছে, যা শব্দ হচ্ছিল!

সেই থেকে তোমার সাধের ঘরে কুলুপ পড়ে আছে রাজা। জানতো মান্যজনকে মান না দিলে কল্যাণের পথে কাঁটা পড়ে। এখন সুরভিমাকে তো পাবে না। পাতালে বরুণরাজা এক বিরাট যজ্ঞ করছেন। [illegible] লাগবে, সব যোগাবার ভার তাঁর ওপর। তাই তিনি সেখানেই আছেন। সাপেরা পাহারা দিচ্ছে। [illegible] নেই। কিন্তু তাঁর মেয়ে নন্দিনী আমার এখানেই আছে। তুমি আর সুদক্ষিণা শুচিশুদ্ধ হয়ে তার সেবা কর। সে হল কামধেনু। সন্তুষ্ট হলে যা চাও তাই দেবে।

এই বলতে বলতেই বন থেকে চরে ফিরে এল অপূর্ব সুন্দর সেই কামধেনু নন্দিনী। কচিপাতার মতো লাল গোলাপী চিকন গা। কপালের ওপর একটি সাদা লোমের বাঁকা রেখা। ঠিক যেন সাঁঝবেলাকার লালচে রঙীন আকাশের কপালে ছোট্ট একটি সাদা বাঁকা চাঁদ উঠেছে। বাছুরটিকে দেখেই মাটি ভিজিয়ে ভিজিয়ে ঝরে পড়তে লাগল তার কুসুমকুসুম [illegible] দুধের ধার। [illegible] ঘায়ে ওড়া ধুলো যখন রাজার গায়ে এসে পড়ল, তাঁর মনে হল যেন তিনি তীর্থে স্নান করছেন।

গুরু বললেন, রাজা, নন্দিনী যখন নাম করতে করতেই এসে পড়েছে, তখন তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতে আর বেশী দেরি নেই। সবসময় ওর কাছে কাছে থেকে সেবা করে ওকে প্রসন্ন করার চেষ্টা কর। বনে যা জন্মায়, তাই খেয়ে থাকবে। নন্দিনী চললে চলবে, দাঁড়ালে দাঁড়াবে, বসলে বসবে, ও জল খেলে তবে তুমি জল খাবে। সকালবেলা চরতে যাবার সময় বৌমাও ভক্তিমতী হয়ে ওকে পুজো করে ওর সঙ্গে যাবে, তপোবনের সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে। আবার সন্দেবেলা ফেরার সময় আগে থেকে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। এইভাবে দুজনে মিলে ওর সেবা করতে থাক, যতদিন না ও প্রসন্ন হয়। কল্যান হোক তোমাদের। আপদ বালাই দূরে যাক। আশীর্বাদ করি, তোমার বাবার মতো তুমিও সেরা পুত্ররত্ন লাভ কর।

দিলীপ আর সুদক্ষিণা সানন্দে গুরুর আদেশ মাথা পেতে নিলেন। হীরের কবাট চুনির চৌকাঠ, পান্নার জানলা, প্রবালের আলনা, মুক্তোর দেয়াল ফটিকের ফোয়ারা, লোকজন সোনায় ঝকঝকে চেহারা—একটি মনিশহর তৈরি করে, রাজাও চোখে দেখেন নি, রানীও কানে শোনেননি, এমন সব আশ্চর্য সুখাদ্য খাইয়ে, স্বর্গ থেকে গন্ধর্বঅপ্সরাদের আনিয়ে নাচগান করিয়ে,

রাজারানীকে আপ্যায়ন করবেন, গুরু বসিষ্ঠের সে ক্ষমতা ছিল। কিন্তু তিনি তা করলেন না। রাজা-রানী এখন তপস্যা করতে এসেছেন। তাঁদের থাকতে হবে সাদাসিধে হয়ে। তাই পাতার কুটিরে পাতার বিছানায় বনের ফলমূল জল খেয়ে শুয়ে পড়লেন তাঁরা। সকালবেলা যখন তাঁদের ঘুম ভাঙল, তখন দশ হাজার ছাত্রছাত্রীর বেদ পড়ার শব্দে গরগম করছে তপোবন। ফাঁকে ফাঁকে ভেসে [illegible] বন ভরানো কান ভরানো মন ভরানো ডাক।

সুদক্ষিণা তাড়াতাড়ি উঠে স্নান করে, নন্দিনীর পায়ে জল দিয়ে শিং ধুয়ে, চন্দন মাখিয়ে মালা পরিয়ে, সুন্দর করে সাজিয়ে দিলেন। তার বাছুরটিকে পেট ভরে দুধ খাইয়ে বেঁধে রাখা হল। তারপর রাজা দড়ি খুলে নন্দিনীকে নিয়ে চললেন বনে। বিদায় দিলেন রানীকে। বিদায় দিলেন অনুচরদের। একা। এখন নন্দিনীই তাঁর রাজ্য। তিনি তাঁর রাখাল রাজা।

কখনো তাঁর মুখে ধরছেন সুস্বাদু ঘাসের গরস। কখনো চুলকে দিচ্ছেন গা। কখনো তাড়াচ্ছেন ডাঁশ-মশা মাছি। নন্দিনী যেমন খুশি যেখানে খুশি চরছে, তিনি তার পেছন পেছন চলেছেন ছায়ার মতো। সম্রাটের মাথায় থাকে উষ্ণীষ, [illegible] পরণে দামী পোষাক, গা ময় দামী গয়না। মাথার ওপর ধরা থাকে প্রকাণ্ড রাজছত্তর। হাতে থাকে রাজদণ্ড। দুপাশে চামর ঢোলায় কিঙ্করীরা। চারপাশে দেহরক্ষীরা খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দেয়। সেসব কিছুই এখন নেই দিলীপের। পরনে সাদাসিধে পোষাক, হাতে ধনুর্বাণ, মাথার চুলগুলি চুড়ো করে জড়িয়ে নিয়েছেন কি একটা বুনো লতা দিয়ে। কিন্তু তবু রাজা রাজাই। তাঁকে দেখে মনে হতে লাগল, তিনি যেন এই বিশাল বন রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট। দুষ্ট প্রাণীদের শায়েস্তা করতে এসেছেন মুনির গোধনের রাখালি করার ছলে।

চোত্-বোশেখের দারুণ গরমে বনে প্রায়ই লাগে দাবানল। সে আগুন নিবে গেল দিলীপ বনে পা দিতে না দিতেই। বনভরে ফুল ফুটে উঠল, ফল ফলে উঠল। দুপাশে বিশাল বিশাল গাছ, মাঝখান দিয়ে শালগাছের মতো উন্নত শরীর, বৃষস্কন্ধ, চওড়া-বুক রাজা যখন হেঁটে যাচ্ছিলেন, তখন গাছেরা জয়ধ্বনি দিচ্ছিল পাখি ডাকার ছলে। কিশোরী লতারা তাঁর গায়ের ওপর ছড়িয়ে দিচ্ছিল কুচিকুচি ফুল। ঠিক যেন খই ছড়াচ্ছে নগরের কিশোরী মেয়েরা। চোখ মেলে তাঁর সেই অপরূপ রূপ দেখতে দেখতে হরিনীরা মনে মনে ভাবছিল, এতদিনে বুঝলুম বিধাতা ঠাকুর আমাদের চোখ গুলোকে কেন এত বড় বড় করেছেন।

রাজপুরীতে রাজার স্তুতি গান গায় বৈতালিকের দল। এখানে কোথায় তারা? কিন্তু দিলীপ পষ্ট শুনতে পেলেন,

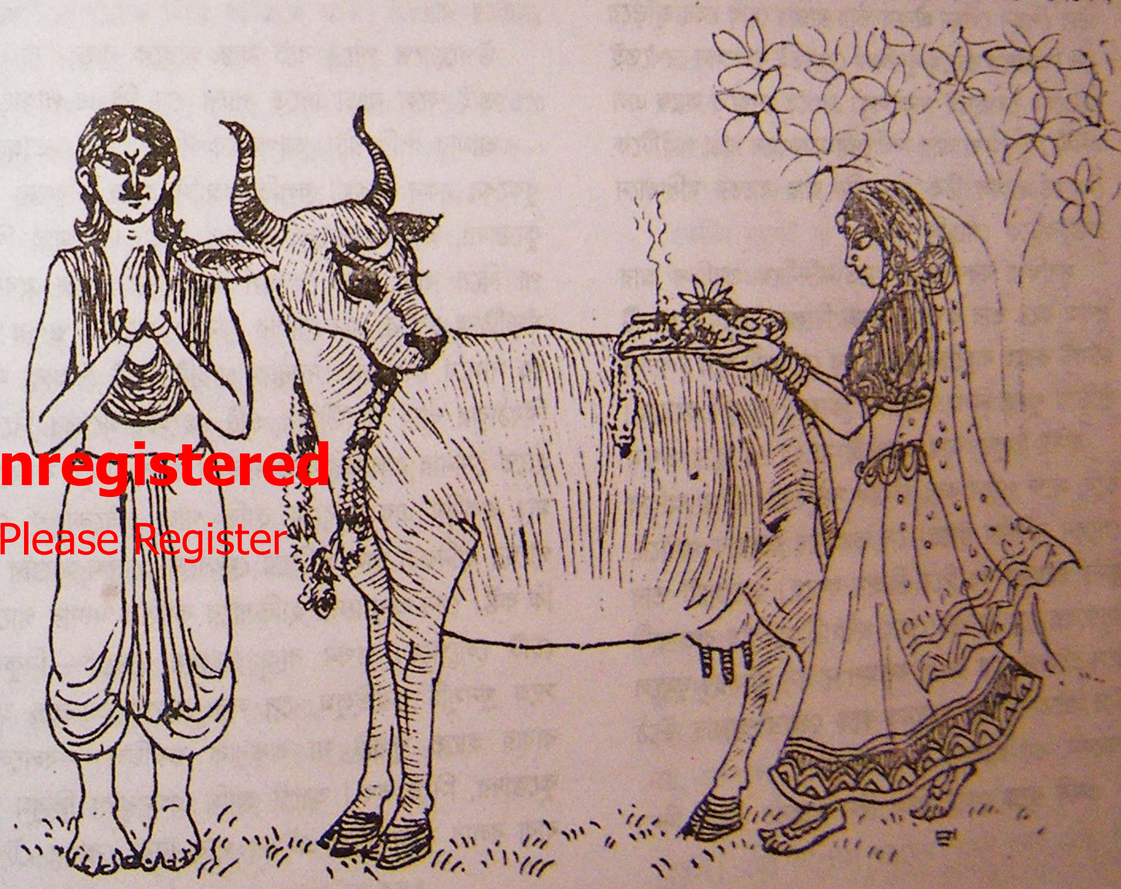

JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register

মাথায় এত ফুল পড়ছে কোত্থেকে? অবাক হয়ে মুখ তুলে রাজা দেখলেন, বিদ্যাধর-বিদ্যাধরীরা মেঘের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে দুহাতে পুষ্পবৃষ্টি করছেন! কোথায় সিংহ, কোথায় কি! ঠিক আপন মায়ের মতো সামনে দাঁড়িয়ে আছেন নন্দিনী। দুধের ধারা বয়ে যাচ্ছে তাঁর বুক ছাপিয়ে, স্নেহের অমিয় [illegible] বলছেন ওঠো বাবা ওঠো। মায়া বলে সিংহ তৈরী করে আমি তোমায় পরীক্ষা করছিলুম। ঋষির প্রতি [illegible] ছুঁতে পারে না। অন্য পশু তো দূরের কথা। গুরুর ওপর তোমার ভক্তি এবং আমার প্রতি তোমার দয়া দেখে আমি বড়োই সন্তুষ্ট হয়েছি বাবা। কী বর চাও, বলো—

দুধ দি শুধু তা ভেবো না, নইকো শুধুই দুধলো গাই। কামধেনু-মা, তুষ্ট হলে দিই যেটি যার ইচ্ছে তা-ই।

তখন, যে-দিলীপ এতদিন ধরে কত প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণ করেছেন, সে-ই তিনি দুটি হাত জোড় করে বললেন, মা, সুদক্ষিণাকে একটি পুত্র দাও। সে যেন প্রতিষ্ঠা করে নতুন বংশ, তার কীর্তি যেন হয় অফুরন্ত।

নন্দিনী বললেন, তথাস্তু। একটি পাতার ঠোঙায় আমার দুধ দুয়ে নিয়ে খাও বৎস।

দিলীপ বললেন, মা, তোমার বাছুরটির এখনো খাওয়া হয় নি। মুনির হোমও বাকি। আমি কি করে খাই?

রাজার একথা শুনে নন্দিনী এত খুশী হলেন যে বলার নয়। তারপর তাঁর সঙ্গে সেই গুহা থেকে বেরিয়ে এসে চললেন তপোবনের দিকে।

রাজার মুখ চোখ দেখে কিছু আর বুঝতে বাকি ছিলনা বসিষ্ঠ ঠাকুরের আর সুদক্ষিণার। তারপর রাজা যখন সব খুলে বললেন আগে গুরুকে, তারপর রানীকে, তখন তাঁদের আনন্দের আর সীমা রইল না। বাছুরের খাওয়া এবং গুরুর হোম হয়ে যাবার পর, গুরুর অনুমতি নিয়ে রাজা নন্দিনীর দুধ খেলেন, যেন অনেকদিনের নির্জলা উপোসের পর পান করছেন অমৃত।

গোচারণ ব্রত শেষ হল। পারণ করিয়ে যাত্রামঙ্গল অনুষ্ঠান করে, গুরু তাঁদের যাবার আয়োজন করে দিলেন। যজ্ঞের আগুন, বসিষ্ঠ-ঠাকুর, অরুন্ধতী-মা এবং বাছুর সমেতে কামধেনু নন্দিনীকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করে রাজরাণী উঠলেন রথে। কি সুন্দর কি উজ্জ্বল কি পবিত্র যে দেখাছিল তাঁদের! কয়েক ঘণ্টার পথ পেরিয়ে নামলেন এসে পতাকায় পতাকায় উৎফুল্ল রাজধানীতে। প্রজারাও এতদিন অদর্শনের পরে রাজাকে পেয়ে প্রাণ ফিরে পেল। রাজার তিন সপ্তাহের ছুটি শেষ হল।

এর কয়েকমাস পরেই এক শুভদিনে সুদক্ষিণার একটি ঘর আলো করা ছেলে হল। ঘরেতে জ্বলছিল রাতের পিদিম [illegible] শিখা নেই, আলো নেই, পটে আঁকা। এমনি সে ছেলের তেজ। রাজা ছেলের নাম রাখলেন রঘু। হাওয়ার মতো। 'লঘু' অর্থাৎ দ্রুতগামী। হাওয়া যখন ঝড় হয়ে বয়, তখন ল হয় যায় র। রংহ, লংহ দুটি জোড়া ধাতু থেকে হয় 'রঘু' আর লঘু। বেদের এক ঋষির বংশ হল 'রহুগণ' অর্থাৎ ঊনপঞ্চাশ হাওয়া! রঘু যখন যুবরাজ হলেন, তখন অশ্বমেধের ঘোড়া নিয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁর দারুন যুদ্ধ হয়েছিল। তার বীরত্ব দেখে খুশী হয়ে ইন্দ্র তাঁকে বর দিয়েছিলেন, তোমার পিতা শত-তম অশ্বমেধ যজ্ঞ না করেই তার ফল লাভ করবেন। পরে সমস্ত ভারতবর্ষ ও পারস্য জয় [illegible] বিজিৎ যজ্ঞ করে তাঁর সর্বস্ব দান [illegible] করেছিলেন। তাঁর অতুলন কীর্তি বলে, ইক্ষ্বাকু-(আখ খাবার জন্য আঁকু পাকু করেছিল যে ছেলে) বংশের নাম ধীরে ধীরে হয়ে গেল রঘুবংশ। রঘুবংশের রাজাদের গুনে মুগ্ধ হয়ে এক মহাকাব্য লিখেছিলেন মহাকবি কালিদাস। তার থেকেই নেওয়া হল এই গল্পটি। রঘুবংশ প্রসাদ এই জাতীয় নাম এখনো চলছে আমাদের বিহারে। তার থেকে বোঝা যায় কালিদাসের এই কাব্য লোকমুখে কত দূর ছড়িয়েছে। রাজার শরীরের বর্ণনায় কবি বলেছেন 'ঊর্জস্বল' অর্থাৎ 'তেজ-ভর্তি'। আমি করেছি একটু ঘুরিয়ে, 'দশাসই'। এসেছে 'দশাস্য' থেকে। [illegible] অর্থাৎ একাই একশো। আর 'যশো-দেহ' মানে যাকে ইংরিজীতে বলে ক্যারিজমা। কালিদাসের কাল নির্ণয় বাকি রইল।

বলতে পারি, অন্তত দুহাজার বছর আগে।
হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল
পণ্ডিতেরা তর্ক করে লয়ে তারিখ সাল।
[illegible]ন রোবি বলতে পারেন, তর্কের সমাধান আসন্ন।

ছবি ঃ রাহুল মজুমদার

JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register

জানা-অজানা শিবরাম

কিন্নর রায়

'মুক্তারামের মুক্তো হয়ে আছেন বাবু শিব্রাম
পঁচাত্তরটি স্মৃতির বছর লেখাটেখায় নো-বিরাম
দেওয়ালে আঁক শিশির ওষুধ ঘাড় ছোঁয়া চুল বাবরি
বিনি-ই তাঁর ভাগ্যবিধাতা ঈশ্বর হন রবিঠ

JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register

এমন একটা ছড়া লিখেছিলাম 'যুগান্তর'-এর রোজনামতায়। আশির দশকে বাংলা দৈনিক 'যুগান্তর' এর পয়লা পাতায় বাঁ দিকের প্রথম কলমে একেবারে নিচের দিকে ছাপা হতো রোজ নামতা। চার লাইনের ছড়া। তার সঙ্গে অমল চক্রবর্তীর দুর্দান্ত কার্টুন। গোটা পরিকল্পনাটাই বিশিষ্ট সাংবাদিক, রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ, ছড়াকার অমিতাভ চৌধুরীর। সঙ্গে ছিলেন দেবব্রত, মুখোপাধ্যায়, অঞ্জন বসু। রোজ নামতায় নামী অনামী সকলেই লিখতেন। 'যুগান্তর'-এর বাইরে থাকা বহু লেখক, ছড়াকার, একেবারে নাম-না জানা ছড়া লেখক, সকলেই 'রোজনামতা'য় নিজেদের ছন্দ-প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতেন।

পঁচাত্তর বছরের শিব্রাম চক্কোত্তিকে শ্রদ্ধার্ঘ জানাতে গিয়ে এই ছন্দবদ্ধ কয়েকটি লাইন লিখেছিলাম, ওঁর পঁচাত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে।

উত্তর কলকাতার মুক্তরাম বাবু স্ট্রিটে শুক্তারাম খেয়ে তক্তারামে মহাআরামে শুয়ে বসে থাকা শিবরাম চক্রবর্তীকে রাস্তায় দু-একবার দর্শনের স্মৃতি মনে আছে এখনও রাস্তা মানে উত্তরকলকাতার পথ। কলেজস্ট্রিট মার্কেটের ভেতর মৃগাল দত্ত গীতা দত্তদের এশিয়া পাবলিশিং এর কাছাকাছি। হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী বেরচ্ছে তখন এশিয়া থেকে খণ্ডে খণ্ডে। সেটা সত্তর দশকের গোড়ায় গোড়ায়। ওখান থেকেই 'রোশনাই' আর 'ঝুমঝুমি' নামে চমৎকার দুটো ছোটদের পত্রিকা বেরয়। 'রোশনাই' বেশ পুরনো, অনেকদিন ধরে বেরুচ্ছে। সাইজও বড়। মাসে একবার বেরয়, ঝুমঝুমি সম্ভবত পনের দিনে একবার। ঝুমঝুমি সম্পাদনা করেন বিশিষ্ট ছড়াকার সরল দে। 'ঝুমঝুমি' আরও ছোটদের জন্য। সাইজেও খানিকটা যেন মিনি বই। সামান্য বড় মিনি বুক-এর থেকে। মনে রাখতে হবে তখন মিনি বুক, মিনি পত্রিকার একটা ফ্যাশান চলছে বাজারে। অমিয় চট্টোপাধ্যায়ের 'পত্রাণু' বেরয়। যার নামাঙ্কন সত্যজিৎ রায়ের করা। 'সেঁউতি' নামে আরও একটি মিনি বই বেরয়। এছাড়া ছিল 'সম্রাজ্ঞী', 'নিক্কণ'। 'নিক্কণ' একটি চমৎকার ভূতের গল্পের সংখ্যা করেছিল সত্তর দশকে। তাতে একটি ভূতের গল্প লিখেছিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। তখন তিনি থাকেন প্রতাপাদিত্য রোডে। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় এর কিছু আগেই বার করেছেন তাঁর লেখা মিনি বই—'বিপ্লব ও রাজমোহন'। এর অনেক বছর পর বেরয় মিনি সাইজের 'আবোলতাবোল।'

তো থাক সে সব কথা। শিবরাম চক্রবর্তী, যিনি নিজের বেশির ভাগ সময়েই বলতে পছন্দ করতেন শিব্রাম চক্কোত্তি তাঁকে প্রথম দেখা যাচ্ছে [illegible] কলেজস্ট্রিট মার্কেটের ভেতর। এশিয়া পাবলিশিংয়ের সামনে। একদম দেব সাহিত্য কুটির-এর পূজা বার্ষিকী 'পারিজাত' 'দেব দেউল', 'মণিহার'-এর আর্ট প্লেট থেকে উঠে আসা শৈল চক্রবর্তীর ছবি। অমন বাবরি, সিল্কের ঢিলে হাতা পাঞ্জাবি, মিলের সাইজ ধুতি, পায়ে পাম্প সু। হাতে নির্ঘাৎ ডালমুট, নয়ত চানাচুরের ঠোঙা।

এরকম গল্পও শুনেছি একজন বেশ সুদর্শনা ও যথেষ্ট সাজগোজ করা মহিলা নাকি হঠাৎই এশিয়া পারলিশিংয়ের সামনে এসে একটু বিহ্বল হয়েই একটা রাস্তা ও সেই রাস্তার সঙ্গে লেগে থাকা বাড়ির ঠিকানা খোঁজ করছিলেন।

'এশিয়ার' কর্মচারীদের ভেতর থেকে কেউ কোনো জবাব দেওয়ার আগেই শিব্রাম বলতে শুরু করলেন।

এ [illegible] তিনি [illegible] তো সে যাই হোক মহিলা জানতে চাইছেন ঠিকানা। এশিয়া পাবলিশিং এর কর্মীরা কোনো জবাব দেওয়ার আগেই শিব্রামের ওপর পড়া জবাব—এখান থেকে একদম সোজা চলে যান। তারপর ডান দিকে যাবেন। ডান দিকে গিয়ে বাঁ দিকে। তারপর সোজা। আবার ডান দিক, তারপর বাঁদিক। এবারে ডান দিক বাঁদিক করতে করতে যেদিকে খুশি চলে যাবেন।

এই যে 'যেদিকে খুশি চলে যাবেন'—এটা শোনা পর্যন্ত আর সেই সুসজ্জিতা। মহিলা দাঁড়ান নি। তিনি হাঁটতে আরম্ভ করেছিলেন।

'এশিয়া' পাবলিশিং-এর সামনে দাঁড়ান কোনো একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, একি, আপনি ঠিকানা না জেনেই ওঁকে এভাবে রাস্তা বাতলে দিলেন!

শিব্রামের নিপাট মুখের জবাব, এত সেজেগুজে বেরিয়েছে। একটু ঘুরুক না।

চার্লি চ্যাপলিনকে অনেকেই বলেছেন, 'বিপজ্জনক [illegible] রামের ক্ষেত্রেও বলা যায়।

[illegible] কথা, মানে গল্পের ভাঁজ। শুনেছি কোনো এক শ্রাদ্ধ বাসরে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সঙ্গে দেখা হয়েছে শিবরামের। তখন 'বেদে, 'কাঠখড় কেরোসিন'-এর অচিন্ত্যকুমার, কবি অচিন্ত্যকুমার 'পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ' লিখে ফেলেছেন। পরমপুরুষ-এর বিক্রিও খুব। অচিন্ত্যকুমার শিবরামকে তখনই কাছে এগিয়ে এসে বললেন, ভাই শিবরাম, এরপরই হয়ত আমাদের দেখা হবে জীবনের ওপারে পরলোকে।

শিবরাম একটু চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, তুমি কি ক্ষেপেছ, পাগল হয়েছ! পরপারে গিয়ে তোমার [illegible] কালো মুখ আমি খোঁজ করব। আমি তো খুঁজে বেড়াব সুচিত্রা সেনকে।

[illegible] আদি অকৃত্রিম মেসবাড়িতে বেশ কয়েকবার গিয়েছি। দৈনিক বসুমতী-তে কলকাতার হালখাতা বলে একটি নিয়মিত কলম বেরত প্রতি সোমবার। যেমন আনন্দবাজার পত্রিকার কলকাতার কড়চা, তখনকার 'যুগান্তর'-এর 'এখানে ওখানে'। 'কলকাতার হালখাতা'য় লিখলে কোনো পয়সা পাওয়া যেত না। দৈনিক বসুমতীর শেষ পাতায় প্রতি সোমবার বেরত বিজ্ঞান প্রসঙ্গ। লিখতেন পথিক গুহ। আর বেরত তরুণ মন। 'তরুণ মন' এ লিখলে দশটা টাকা পাওয়া যেত। সেটা ১৯৭৩ সাল টাল হবে। তো সে যাই হোক, এই 'কলকাতার হালখাতা'-য় আইটেম হিসেবে শিবরাম চক্রবর্তীকে আনানোর জন্য বেশ কয়েকবার মুক্তারাম স্ট্রীটে ওঁর আদি অকৃত্রিম ঘরে যাই। কলকাতার হালখাতা [illegible] আত্মীয় সুভাষ মৈত্র। সুভাষদাও বহুবছর প্রয়াত। উনি যে ঘরে থাকতেন তাঁর সমস্ত দেওয়াল জুড়ে ঠিকানা লেখা। কেন দেওয়ালে এই লেখালেখি—জিগ্যেস করলে সাদা-সাপটা জবাব পাওয়া দেত—খাতা হারায় ভাই। দেওয়াল হারায়না।

কী করে যে খুঁজে পেতেন ওখান থেকে ঠিকানা!

কৌটোর গুঁড়ো দুধকে তিনি বলতেন 'রাবড়িচূর্ণ।' নেশা করতে হলে রাবড়ির নেশাই করা উচিত, এমনটি বলতেন। অক্লেশে বাইরে থেকে ঘুরে এসে রাজ্যের ধুলো লাগা পা নিজের বিছানার চাদর তুলে মুছতে মুছতে বলতেন—

'আমার ঘরে নেইকো পাপোশ
তাও করি নি আপশ'।

'মেয়েরা বিয়ের আগে পরি, বিয়ের পরেই পর'—এমন কথা শুনেছি তাঁরই মুখে। মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটে একবার পৌঁছে গেলে হল। তিনি অনায়াসে পরিচিত, অতি পরিচিত, অপরিচিতদের একই সুরে, অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে ডেকে নিতেন ভেতরে। ভেতর মানে তাঁর মেসঘরে।

ষাট দশকের শেষ অথবা সত্তরের একদম গোড়ায় তাঁর 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা' আর প্রবোধকুমার সান্যালের 'বনস্পতির বৈঠক' ধারাবাহিক ভাবে বেরতে থাকে সাপ্তাহিক দেশ-এ। তার অনেক আগেই হর্ষবর্ধন, গোবর্ধন (গোবরা), ইতু, বিনিদের কথা শিব্রামের পাঠক হিসাবে আমরা অনেকেই জেনে গেছি। 'বনস্পতির বৈঠক' ও 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা' নিয়ে বহু চিঠিপত্রের বাদ-প্রতিবাদ বেরয় দেশ-এ।

আনন্দবাজার পত্রিকা'য় তিনি একসময় 'অল্পবিস্তর' কলমটি নিয়মিত লিখতেন। সেখানে একটি বড় মাছ আর ছোট মাছের ছবি থাকত। ছোটমাছের পেছনে বড় মাছ। বাঁকা চোখে লিখতেন 'দৈনিক বসুমতী'-তে। তাঁর

শ্রীশৈলের কল্পনায় শিবরামের চরিত্ররা

JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register

মেস ঘরে গেলে রাবড়িচূর্ণ জুটত কারও কারও কপালে, এমন শুনেছি।

এম সি সরকারের আড্ডায় তাঁকে পাওয়া যেত নিয়মিত। সেই আড্ডার মূল কেন্দ্রবিন্দু সুধীরচন্দ্র সরকারমশাই। এম সি সরকার তখন প্রকাশক হিসাবেও যথেষ্ট নামী। 'মৌচাক' নামে ছোটদের পত্রিকাটি বেরত ওখান থেকেই। এই আড্ডায় আসতেন তুষারকান্তি ঘোষ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মাখনলাল সেন, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বিশু মুখোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। আসতেন আরও অনেকে। শিবরামও ছিলেন এই সাহিত্য আড্ডার অন্যতম আড্ডাধারী।

তাঁর ভাগ্নে ভাগ্নীরা ছিলেন 'অতি বিখ্যাত।' কলেজস্ট্রিট মার্কেটের ভেতর শিব্রাম চকরোবরতির ভাগ্নে ভাগ্নীর দোকান নামে একটি বইয়ের দোকান ও প্রকাশন সংস্থা তাঁর মৃত্যুর পরও বেশ কয়েক বছর টিকে ছিল। এখন অবশ্য এর অস্তিত্ব আছে কিনা জানি না।

সত্তরের দশকে সাক্ষরতা প্রকাশন নামে একটি প্রকাশন সংস্থা তৈরি হয়। নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি ও সাক্ষরতা প্রকাশন ছিল একই গাছের দুটি ডাল। পার্থ সেনগুপ্ত, স্বপ্না দেবরা ছিলেন এই সংস্থার সঙ্গে। সাক্ষরতা প্রকাশন থেকেই সত্তর দশকে খণ্ডে খণ্ডে বেরতে শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্র রচনাবলী, কালীপ্রসন্ন সিংহর গদ্য মহাভারত, পরে শিবরাম রচনাবলী প্রকাশিত হতে শুরু করে এখান থেকেই। প্রেমেন্দ্র মিত্রর 'পরাশর সমগ্র'ও ওরা ছাপে। বইয়ের ছাপার কোয়ালিটি ও কাগজের মান খুব ভালো ছিল না। বহুবছর পর শিব্রাম রচনাবলী নবপত্রর প্রসূন বসু ছাপতে শুরু করেন। আলাদা করে বেরয় 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা'। শুনেছি শিব্রামের পুরো রচনা সমগ্র প্রকাশের ব্যাপারে নানা আইনি জটিলতা ছিল। একাধিক জনকে নাকি রচনাবলী ছাপার আইনি স্বত্ত লিখিতভাবে দিয়েছিলেন শিবরাম। একথা কতদূর সত্যি অথবা মিথ্যে, জানি না।

'আজকাল'-এর সাংবাদিক অসীমকুমার মিত্রর সঙ্গে শিবরাম চক্রবর্তীর খুবই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল একসময়। অসীমবাবু বেশ কয়েক বছর হল অবসর নিয়েছেন 'আজকাল' থেকে। তাঁর কাছেও শিবরাম সম্বন্ধে একথা শুনেছি।

এটা অবশ্য অসীমবাবুর বলা গল্প নয়, অন্য কেউ বলেছিলেন। কোনো একটি ছোটদের পত্রিকায় শিবরাম চক্রবর্তীর একটি ধারাবাহিক উপন্যাস ছাপা হচ্ছে। দু-তিন সংখ্যা বেরনোর পর পাঠকদের কাছ থেকে সম্পাদকের দপ্তরে চিঠি আসতে লাগল—এই লেখাটি শিররামেরই অন্য আর একটি লেখার হুবহু প্রতিরূপ।

তখন এত ফোনাঘাতের রেওয়াজ চালু হয় নি। মোবাইল. তো (রীতিমত) স্বপ্নেরও বাইরে। চিঠিপত্রই তখন সাধারণজনের অনেকখানি বল-ভরসা।

চিঠির পর চিঠি। চিঠির পর চিঠি। পত্রাঘাত পেতে পেতে সম্পাদক ভয়ানক বিব্রত, ক্লান্ত।

শিবরামকে সেই চিঠির তাবড়া এনে দেখাতে তাঁর সাদা মুখের জবাব—একটা বয়সে পুরনো সব স্মৃতি ফিরে ফিরে আসে। আমারও [illegible]

তাই বলে একদম কমা, সেমিকোলন, দাঁড়ি, জিজ্ঞাসা চিহ্ন সমেত ফেরত আসছে লেখাটা! সম্পাদক এক গলা জলে পড়া গলায় জানতে চাইলেন।

শিবরামের উত্তর, কী করব ভাই! স্মৃতি ফিরে ফিরে আসছে। দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন সমেতই ফেরত চলে আসছে।

তাঁকে নিছকই ছোটদের লেখক, হাসির লেখক—এমন একটা দাগ মেরে নির্দিষ্ট কোনো খোপে পুরে দেওয়াটা বোধহয় নিতান্তই অতি সরলীকরণ করা হবে। তিনি কখনই নিছক ছোটদের লেখক ছিলেন না। হর্ষবর্ধন কাহিনী কোনোভাবেই নেহাতই ছোটদের লেখা নয়। এ নিয়ে আলাদা একটা প্রবন্ধ লেখা যেতে পারে। যেমন সুকুমার রায় বা ত্রৈলোক্যনাথ কিংবা ভোঁদড় বাহাদুর-এর স্রষ্টা গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ এঁরা কেউই নিছক ছোটদের লেখক ছিলেন না। সুকুমার রায়, শিবরাম দুজনেই অসম্ভব রাজনীতি সচেতন। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে থেকেই তিনি যেন একটু জবুথবু, খানিকটা স্মৃতির জড়তা নিয়ে আমাদের মধ্যে ছিলেন। তেলচিটে বালিশ, অপরিচ্ছন্ন বিছানার চাদর, অগোছালে মেস ঘর, শীতে পুরো হাতা সোয়েটার—সব নিয়েই শিবরাম। তাঁর বাবরি, গালের একটু বড় আঁচিল, উজ্জ্বল একজোড়া চোখ সবই ছিল। কেবল বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মাথার চুল পেকেছে, কমে এসেছে। দৃষ্টিও হয়েছে সামান্য নিষ্প্রভ। তাঁর ভাই

শিবসত্যবাবুর কিছু কিছু কথা নানা সময়ে বেরিয়েছে খবরের কাগজে। বিশেষ করে শিবরামের জীবনের শেষ বেলায়।

শিবরাম যখন তখনকার ফার্স্ট ক্লাস মানে ক্লাস টেনের ছাত্র, তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ একবার গিয়েছিলেন তাঁদের গ্রাম, মালদহের চাঁচলে। তিনি পড়তেন মালদহ [illegible] আর দাশের বক্তৃতা এমনভাবে নাড়িয়ে দিল শিবরামকে যে, তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে এলেন কলকাতায়, একদম সোজা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বাড়িতে। সেটা ১৯২১।

'বাড়ি থেকে পালিয়ে' নামে একটি বই লিখেছিলেন শিবরাম। পরে তা নিয়ে ছবি করেছিলেন বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিককুমার ঘটক। শিবরামের কাঞ্চন আর ঋত্বিককুমারের কাঞ্চন—দুজনকেই ভোলা যায় না।

তার মৃত্যুর সময়—১৯৮০ সালে দৈনিক বসুমতী-তে দক্ষিণ শহরতলির সংবাদদাতা হিসাবে কাজ করি। এক কলম খবর ছাপা হলে পাঁচ টাকা পাই। প্রশান্ত সরকার তখন 'দৈনিক বসুমতী'-র সম্পাদক। সবে মা মারা [illegible]

শিব্রাম প্রয়াণের খবর এল 'বসুমতী' দপ্তরে। অনেকের

মন্তব্য, মতামত নিয়ে কপি সাজাতে হবে। তখন তো চ্যানেলের এত এত বাড়-বাড়ন্ত নেই। সত্যজিৎ রায়কে ফোনে ধরলাম। তখন বিকেল বিকেল, কি সন্ধ্যার মুখে মুখে হবে। খবরটা শুনে উনি যেন একটু থমকেই গেলেন। ওঁর প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল, সে কি! মারা গেলেন। তারপর অসাধারণ কণ্ঠ ঐশ্বর্য নিয়ে একটু থেমে, যাকে বলে পজ দিয়ে বললেন, খুবই বড় লেখক ছিলেন। তারপর অনেক কথা, টানা গড় গড় গড় গড় করে। শিবরাম চক্রবর্তীর কথা উঠে এলে ওঁর প্রয়াণের দিনটির কথাও স্মরণে আসে। সেই সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের অসামান্য মন্তব্য।

ছবি : শৈল চক্রবর্তী

পৃথিবীর বিষাক্ততম প্রাণী

সমুদ্রের শয়তান? নয়তো কি? ওদের ছোঁয়ায় যে মৃত্যু অবধি হতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্রতীরে ওদের দংশনে মৃত্যু হয়েছে বহু মানুষের। অন্যান্য দেশ থেকেও নিয়মিত মৃত্যুর খবর আসে ওদের ছোঁয়ায়। নাম ওদের বক্স জেলিফিস, কেউ ওদের ডাকে সি ওয়াস্প (Sea Wasp) নামে, কেউবা ডাকে মেরিন স্টিঙ্গার (Marine Stinger) বলে। ওদের বিষ কাজ করে না একমাত্র সমুদ্রের কচ্ছপের শরীরেই। এমনকি এই কচ্ছপের প্রিয় খাদ্যও হল ওই সমুদ্র শয়তানেরা। এবার তাহলে সমুদ্রে নামার আগে দোস্তি করতে হবে সমুদ্র কচ্ছপের সঙ্গে।

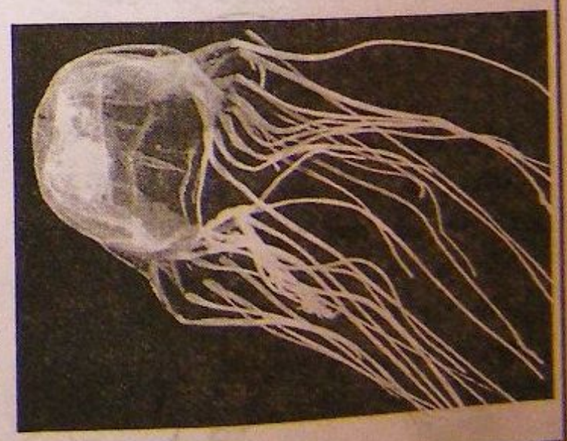

JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register

সন্দেশের প্রসাদ রায়, সন্দেশের ময়ূখ চৌধুরী

দেবাশিস সেন

ময়ূখ চৌধুরী নামটি উচ্চারণ করলেই বাঙালি পাঠকদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে দুর্দান্ত কিছু কমিক্সের ছবি। কোন সন্দেহ নেই বাংলা সিরিয়াস কমিক্সের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর নাম ময়ূখ চৌধুরী, তাঁর তৈরী অধিকাংশ কমিক্সগুলির কাহিনীকার শিল্পী স্বয়ং, কিন্তু কমিক্সের অসাধারণ ছবির আড়ালে [illegible] যেন [illegible] চৌধুরী। কিন্তু শক্তিশালী তুলির পাশাপাশি ময়ূখ চৌধুরী যে একটি অসামান্য কলমেরও অধিকারী তার প্রমাণ তিনি রেখে গেছেন প্রচুর গল্প উপন্যাসে। সংখ্যার নাম চার, কায়না, গুণ্ডা, একদা আর্যাবর্তে ইত্যাদি কাহিনিগুলি শেষ করার পর আমরা দ্বিধাগ্রস্ত হই—কে বড়? গল্পকার ময়ূখ চৌধুরী নাকি কমিক্স শিল্পী ময়ূখ চৌধুরী? এই দুই ময়ূখ চৌধুরীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার পাশাপাশি উঠে আসে আরেকটি নাম—প্রসাদ রায়, অলঙ্করণ শিল্পী প্রসাদ রায়।

একজন ইলাস্ট্রেটরের কাজের মূল্যায়ণ কি করা যায় তার তৈরী কমিক্স-এর মধ্যে দিয়ে? বোধহয় না। কোন গল্পের অলঙ্করণ এবং কমিক্সের ছবির ফ্রেমগুলিতো সম্পূর্ণ আলাদা। ময়ূখ চৌধুরীও নিশ্চয়ই সেই ধারণাই পোষণ করতেন। [illegible] থাকতো প্রসাদ রায়-এর। জীবনের প্রথম দিকের দুটি কমিক্সে (ঋণশোধ, পেক্কা) শিল্পী হিসাবে নাম ছিল প্রসাদ রায়ের। লেখক প্রসাদ রায়ও প্রথম জীবনে লিখেছেন গল্প (দেব সাহিত্য কুটিরের পূজাবার্ষিকী 'উদ্বোধন', ১৩৭৮ এ প্রকাশিত 'আঁধার রাতের পথিক') এর পরে পুরো সাহিত্য জীবনেই আমরা পাই তিন ব্যক্তিত্বকে—কমিক্স শিল্পী ময়ূখ চৌধুরী, ইলাস্ট্রেটর প্রসাদ রায়, গল্পকার ময়ূখ চৌধুরী।

ময়ূখ চৌধুরী, প্রসাদ রায়—এই নামেই পরিচিত হলেও দুটি নামই ছিল তাঁর ছদ্মনাম। পরবর্তী জীবনে আরো তিনটি ছদ্মনামও ব্যবহার করেছিলেন কমিক্স শিল্পী। সূত্রধর গুপ্ত, [illegible] অবশ্য ব্যবহৃত হয়েছিল অল্প কটি কমিক্সেই। পাঠকরা পরিচিত তাঁর প্রথমে উল্লেখিত ছদ্মনাম দুটির সঙ্গেই। আর এতো সব নামের আড়ালে হারিয়ে গেছে তাঁর পিতৃদত্ত নামটিই। তাঁর সেই নাম শক্তিপ্রসাদ রায়চৌধুরী তিনি সাহিত্যের আঙ্গিনায় কখনোই ব্যবহার করেননি।

গত শতাব্দীর শেষ ভাগের চার দশকেরও বেশী সময় ধরে বাংলার কিশোর কিশোরীদের মাতিয়ে রেখেছিলেন ময়ূখ চৌধুরী। ছোটদের সন্দেশের পাতায় হয়তো তিনি তুলনায় কম সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু গুণগত মানে সেগুলির স্থান ও ওপরের দিকেই। আজকের আমাদের আলোচনার বিষয় তাই সন্দেশের পাতায় গল্পকার ময়ূখ চৌধুরী এবং অলংকরণ শিল্পী প্রসাদ রায়। [illegible] এর [illegible] মাসে (মে, ১৯৬১) সত্যজিৎ রায় এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায় [illegible] সম্পাদনায় যাত্রা শুরু করে তৃতীয় পর্যায়ের সন্দেশ। প্রথম বছরেই সন্দেশের পাতায় আবির্ভাব হয় কমিক্স শিল্পী, লেখক এবং শিল্পী ময়ূখ চৌধুরী ও প্রসাদ রায়ের। ইনিংসের সূচনায় ময়ূখ চৌধুরীকে পিছনে ফেলেছিলেন শিল্পী প্রসাদ রায়। আশ্বিন সংখ্যায় (অক্টোবর, ১৯৬১) তিনটি গল্পের অলংকরণ

JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register

করেছিলেন তিনি, ফাল্গুনে (মার্চ, ১৯৬২) প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কমিক্স। আর চৈত্র সংখ্যায় আত্মপ্রকাশ করেন ময়ূখ চৌধুরী। যে পাঁচটি গল্প আর দুটি উপন্যাস তিনি লিখেছিলেন সন্দেশীদের জন্য তার প্রথমটি প্রকাশিত হয়েছিল ওই সংখ্যায় (এপ্রিল, ১৯৬২)।

গল্প ঃ ময়ূখ চৌধুরী, ছবি ঃ প্রসাদ রায়, খুব স্বাভাবিক

একটি শিরোনাম। ময়ূখ চৌধুরীর গল্পে তো অবশ্যই অংলকরণ থাকবে প্রসাদ রায়ের। এবং থাকতোও তাই। সন্দেশে প্রকাশিত ময়ূখ চৌধুরীর সাতটি গল্প উপন্যাসের ছটিতেই শিল্পী ছিলেন প্রসাদ রায়। ব্যতিক্রম 'নায়কের জন্ম।' প্রকাশিত হয়েছিল অষ্টম বর্ষের শারদীয়া সংখ্যায় (ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৭৫, সেপ্টেম্বর অক্টোবর ১৯৬৮)। ময়ূখ চৌধুরীর লেখা এই গল্পটির অলংকরণ করেছিলেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। ময়ূখ চৌধুরীর সাহিত্য জীবনে এই ধরণের ব্যতিক্রম বিরল দৃষ্টান্ত। অবশ্য এই প্রসঙ্গে অন্য একটি পত্রিকায় প্রকাশিত লেখকের একটি গল্পের কথা উল্লেখ করতে হয়। কিশোর ভারতী চৈত্র, ১৩৭৯ সংখ্যায় প্রকাশিত ময়ূখ চৌধুরীর অসাধারণ গল্প "গুণ্ডা"র অলংকরণ করেছিলেন আরেক প্রথিতযশা শিল্পী নারায়ণ দেবনাথ। আর সন্দেশে প্রকাশিত তাঁর শেষ উপন্যাস "শায়ক"-এর হেড পিস করেছিলেন বর্তমান সন্দেশ সম্পাদক সন্দীপ রায়।

ময়ূখ চৌধুরীর গল্পের মূল বিষয় অ্যাডভেঞ্চার, রহস্য, রোমাঞ্চ। বীর চরিত্রের দুরন্তপনা ছড়িয়ে থাকে তাঁর আঁকা এবং লেখার প্রতিটি ছত্রে। এই প্রসঙ্গে চোখের সামনে ভেসে উঠল সন্দেশের সম্পাদকীয় দপ্তরের একটি দৃশ্য। অনেক বছর আগের কথা। সন্দেশের বার্ষিক অনুষ্ঠানে সেবার অভিনীত হবে একটি নাটক। কিছু খুদে সন্দেশী নিয়মিত হাজিরা দিচ্ছে সন্দেশের ভেতরের ঘরে অনুষ্ঠিত রিহার্সেলে। সেদিন ময়ূখ চৌধুরী এসেছিলেন সন্দেশের দপ্তরে। বাইরের ঘরে বসে বড় সন্দেশীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। ভেতরের খুদে সন্দেশীদের কাছে কেউ বোধহয় খবরটা পৌঁছে দিয়েছিল। নিমেষে রিহার্সাল ভেঙ্গে দুই ঘরের মধ্যের দরজায় উঁকি দিয়ে ছিল কয়েকটি কৌতূহলী মুখ। [illegible] দর্শন লাভ করার পরেই প্রত্যেকটি মুখে নেমে এসেছিল [illegible] হতাশা। [illegible] কথাই, ইনিই ময়ূখ চৌধুরী! ধ্যুৎ।

ওদের কল্পনায় হয়তো আঁকা ছিল দুরন্ত, দুর্ধর্ষ স্বাস্থ্যবান কোনও নায়কের ছবি।

আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী না হলেও ময়ূখ চৌধুরী কিন্তু ছিলেন প্রচণ্ড সাহসী। কিশোর বয়সে নিয়মিত বক্সিং চর্চা করতেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক মঞ্জিল সেন এবং ময়ূখ চৌধুরী ছিলেন সহপাঠী। মঞ্জিল সেনের কাছে ময়ূখ চৌধুরীর অনেক ডানপিটেমির গল্প শোনা যায়। তরুণ বয়সে পকেটে একটি হাতুড়ি নিয়ে ঘুরতেন ময়ূখ চৌধুরী। ওই হাতুড়ির সাহায্যে একবার একজন মানুষকে [illegible] হাত থেকে রক্ষাও করেছিলেন তিনি।

গল্পকার ময়ূখ চৌধুরীর [illegible] আলোচনার। আগে একবার চোখ ফেরানো যাক শিল্পী প্রসাদ রায়ের দিকে। ময়ূখ চৌধুরীর লেখার বাইরেও অনেক লেখকের গল্পে অলংকরণ করেছেন প্রসাদ রায়। আশ্বিন, ১৩৬৮ সংখ্যায় আবির্ভাবের পরের আড়াই বছর অনেক লেখকের গল্পের অলংকরণ করেছিলেন প্রসাদ

রায় কিন্তু ১৩৭০ এর পরে সন্দেশের পাতায় অন্য লেখকদের গল্পে প্রসাদ রায়ের অলংকরণ প্রায় নেই বললেই চলে। আশ্বিন সংখ্যায় যে তিনজন লেখকের গল্পের ছবি এঁকেছিলেন তিনি, তাঁরা হলেন আশাপূর্ণা

দেবী, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও ক্ষিতীশ রায়। ক্ষিতীশ রায়ের লেখাটি ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পত্তি সমর্পণ-এর নাট্যরূপ। এর পরের আড়াই বছরে যাঁদের লেখার সঙ্গে ছিল প্রসাদ রায়ের অলংকরণ তাঁরা হলেন অলোকেন্দ্র ঠাকুর (কুঁজোর কাহিনী), আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন (গাছের নাম বাঘশাল), পুন্যলতা চক্রবর্তী ([illegible] ছেলে), সুবিমল রায় (ছোট্ট [illegible]), বাদল চট্টোপাধ্যায় (জোসেফ ও কেম্পেলবিং এর 'কিং কোবরা' অবলম্বনে 'নাগরাজ'), নলিনী দাশ (কাটুকিরা রহস্য ও পলাশগড়ের রহস্য) শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (সদাশিবের ঘোড়া ঘোড়া কাণ্ড), রোজমেরি মুখোপাধ্যায় (বি-মা-গো-বি), বুদ্ধদেব গুহ (যমদুয়ারে ছোকরা বাঘ), অমল বন্দ্যোপাধ্যায় (এইচ. জি. প্যাটারসনের ম্যান ইটারস অবলম্বনে সাভোর প্রান্তরে)। এরমধ্যে 'নাগরাজ' এবং 'পলাশগড়ের রহস্য' প্রকাশিত হয়েছিল ধারাবাহিক ভাবে কয়েকটি সংখ্যায়। প্রতি সংখ্যায় নতুন নতুন ছবি এঁকেছিলেন শিল্পী, এমনকি নাগরাজের জন্য একাধিক হেডপিসও করেছিলেন তিনি, কিন্তু যে লেখাটির অলংকরণ শিল্পী হিসেবে প্রচণ্ড গর্ববোধ করতেন [illegible] সম্পাদক সত্যজিৎ রায়ের "সেপ্টোপাসের খিদে"। প্রকাশিত হয়েছিল সন্দেশের

দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ ১৩৬৯)। পরবর্তী সময়ে প্রসাদ রায় সন্দেশের পাতায় এসেছেন ময়ূখ চৌধুরীর অলংকরণ শিল্পী হিসেবেই। আপাতদৃষ্টিতে চোখে পড়ছে এবং অন্য লেখকের মাত্র দুটি লেখার সঙ্গে প্রসাদ রায়ের অলংকরণ, গঙ্গেশ বিশ্বাসের 'নয়া বাঘের সদর সফর' [illegible] এবং ক্ষিতীশচন্দ্র দত্তের বাঘে মানুষে (কার্তিক ১৩৮৭)। শিল্পী প্রসাদ রায়ের অনুপস্থিতি অবশ্যই ক্ষতি করেছে সন্দেশের।

প্রসাদ রায়ের খ্যাতি তাঁর আঁকা জীবজগতের ছবির জন্য। এই বিষয়ে যে তিনি শ্রেষ্ঠ বাঙালি শিল্পী সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। চিড়িয়াখানায় গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পশুপাখির হাবভাবে মনোনিবেশ করে এবং ও বিষয়ে প্রচুর পড়াশোনা করে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তিনি। তাঁর আকার আরেকটি মূল বৈশিষ্ট্য হল অ্যাকশন ধর্মী ছবি। সন্দেশের পাতায় তাঁর অধিকাংশ অলংকরণই অ্যাকশন ধর্মী। প্রথমেই মনে পড়ে "সেপ্টোপাসের খিদে"র শেষ ছবিটির কথা। লেখকের "বাদশা প্রচণ্ড টানে বকলস ছিঁড়ে ধাক্কার চোটে অভিকে উল্টিয়ে ফেলে তীরবেগে পাগলের মতো ছুটল ওই গন্ধের উৎসের দিকে" লাইনটি অসাধারণভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে প্রসাদ রায়ের তুলিতে। শুধু তাই নয়, লাইনটির প্রতিটি শব্দকে আমরা খুঁজে পাই ওই ছবিটিতে। গল্পটির হেডপিস এবং পুরোপাতা জোড়া (সেপ্টোপাসের কবলে অভিজিৎ) ছবিটিতেও রয়েছে অ্যাকশন। এরপরেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে 'সদাশিবের ঘোড়া ঘোড়া কাণ্ড'তে ঘোড়সওয়ার সদাশিবের ছবিটি (আশ্বিন ১৩৬৯) পাহাড়ী পথে দুরন্ত বেগে ছুটে চলা ঘোড়া, গোটা দুয়েক ছিটকে যাওয়া পাথর এবং ঘোড়ার পায়ের তুলির হালকা আঁচড়ে ফুটে উঠেছে গতি। এছাড়াও অসাধারণ কিছু অ্যাকশন ধর্মী ছবি রয়েছে ময়ূখ চৌধুরীর 'একদা আর্যাবর্তে' (কার্তিক—চৈত্র ১৪০০), "শায়ক (বৈশাখ—শ্রাবণ ১৪০১) , "নাগরাজ" (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯—শ্রাবণ ১৩৬৯) "কুঁজোর কাহিনী" (মাঘ ১৩৬৮), "ছোট্ট ছোট্ট ঘটনা" (চৈত্র ১৩৬৮) ইত্যাদি গল্পে। আর জন্তু জানোয়ার সংক্রান্ত গল্পগুলিতে তো অ্যাকশনের কোনও অভাবই নেই।

ময়ূখ চৌধুরী এবং অন্য লেখকদের গল্পে প্রচুর জন্তুজানোয়ার এঁকেছেন প্রসাদ রায়। সবচেয়ে বেশী এঁকেছেন বাঘের ছবি। বাঘের বিভিন্ন ভঙ্গির ছবি নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী। বাঘের হাঁ করা মুখের ছবি ('যমদুয়ারে ছোকরা বাঘ', ভাদ্র ১৩৭০), বাঘের সাঁতার কাটা ('নাগরাজ', জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯), আক্রমণে উদ্যত বাঘ ('উদভ্রান্ত শিকারী', শ্রাবণ ১৩৮৩), শিকারের ওপরে লাফ দেওয়ার আগের মুহূর্তে ('বাঘে মানুষে', কার্তিক ১৩৮৭), গজেন্দ্রগমনে চলা বাঘ এবং জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ওপর দিয়ে লাফ ('নয়াবাঘের সদর সফর', ভাদ্র আশ্বিন ১৩৮৫) —শুধু ছবিগুলি দেখলেই বাঘের চরিত্র সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে পারে কিশোর কিশোরীরা। বাঘের শারীরিক এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে ছবিগুলিতে। শুধু 'গাছের নাম বাঘশাল' গল্পের বাঘটি শিল্পী এঁকেছিলেন একটু অন্য স্টাইলে। হালকা আঁচড়ের স্কেচে ফুটে ওঠা বাঘটির ছবি খুব ভালো হলেও মনে হয় যেন অন্য শিল্পীর আঁকা।

বাঘ ছাড়াও অন্য জন্তুরাও এসেছে প্রসাদ রায়ের ছবিতে সিংহ (মরণ খেলার খেলোয়াড়), কুমির, হরিণ, কিংকোবরা (নাগরাজ), বুনো কুকুর (গল্পের চেয়ে ভয়ংকর, অগ্রহায়ণ, ১৩৭০), পুমা (নয়টি ছুরির মালিক, ভাদ্র-

JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register

আশ্বিন, ১৩৮৫) ইত্যাদি হরেক প্রাণীই নিখুঁত চেহারায় হাজিরা দিয়েছে সন্দেশের পাতায়। কাটুকিরা রহস্য (ভাদ্র ১৩৬৯) তে মূল খলনায়ক একটি প্রাণী। কিন্তু তার পরিচয় পাঠক জানতে পারতে একেবারে শেষে। গল্পটির রহস্য ফাঁসে বিন্দুমাত্র ইশারা না দিয়ে শিল্পী হেডপিসে ব্যবহার করেছেন মাত্র দুটি অক্ষিগোলক—শিল্পীর মুন্সিয়ানাকে বাহবা না দিয়ে পারা যায় না।

এই প্রসঙ্গে চোখের সামনে ভেসে ওঠে সম্পত্তি সমর্পণের হেডপিসটি। গ্রামের নিশুত রাতের ছমছমে ভাবটি অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী শুধুমাত্র সিল্যুটে ব্যবহৃত গাছগাছালি, বাড়ি এবং আকাশের গোল চাঁদের দিকে মুখ তুলে থাকা দুটি শেয়ালের ছবি এঁকে।

শিল্পী প্রসাদ রায়ের বিরুদ্ধে একটি ব্যাপারে মৃদু অনুযোগ তোলা যেতেই পারে। বাঙালি চরিত্রের ছাপ তাঁর আঁকা মানুষের মুখ গুলির মধ্যে কিন্তু ঠিক খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিদেশী মানুষগুলিকে তিনি এঁকেছেন নিখুঁতভাবে। খলনায়কদের চরিত্রের ভয়ংকরতা খুব ভালো ফুটিয়ে তুলেছেন বিভিন্ন পোর্ট্রেটে। (নাগরাজ), কিন্তু শিশু নিতাইকে (সম্পত্তি সমর্পণ) ধুতি পাঞ্জাবী পরানো সত্ত্বেও কিন্তু ওকে বাঙালি ভাবতে একটু কষ্ট হয়। অবশ্য একই সঙ্গে স্বীকার করতেই হবে আলো আঁধারিতে হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকা নিতাইএর অসহায়তা কিন্তু অসাধারণ ভাবে ফুটে উঠেছে।

লেখক ময়ূখ চৌধুরীর প্রিয় বিষয় ছিল জীবজগত এবং ইতিহাস। সন্দেশের পাতায় তিনি লিখেছেন মোট পাঁচটি গল্প এবং দুটি উপন্যাস। "মরণ খেলার খেলোয়াড়", "গল্পের চেয়ে ভয়ংকর", "উদভ্রান্ত শিকারী" এবং "নয়টি ছুরির মালিক" গল্পগুলি বিভিন্ন দেশের শিকার কাহিনী। "নায়কের জন্ম" গল্পটি ইতিহাসভিত্তিক। ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত একদা আর্যাবর্তে এবং "শায়ক" উপন্যাসদুটি চন্দ্রগুপ্তের জীবনভিত্তিক দুটি কাল্পনিক উপন্যাস। এই সাতটি লেখাতেই রয়েছে রহস্য, রোমাঞ্চ এবং অ্যাডভেঞ্চার, যা বিনা সব বয়সী পাঠকেরই দারুন প্রিয় বিষয়।

অ্যাডভেঞ্চার ময়ূখ চৌধুরীর লেখার মূল সূত্র। এছাড়া তাঁর লেখার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল তাঁর ভাষা। লেখক নিজে মনে করতেন বিষয় গুরুগম্ভীর হলে লেখার ভাষাও হওয়া উচিত গুরুগম্ভীর। সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি ভঙ্গি তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। কিছুটা জটিল হলেও তাঁর লেখা পড়তে কিন্তু কখনই হোঁচট খেতে হয়না।

একটা সময় শিশু কিশোরদের পত্রিকায় অন্যতম আকর্ষণ ছিল শিকার কাহিনী। দেশে শিকার নিষিদ্ধ হবার পর আস্তে আস্তে পত্রপত্রিকা থেকেও অদৃশ্য হয়ে গেছে শিকার কাহিনী। অবশ্য এতে বাংলা সাহিত্যের আদৌ কোন ক্ষতি হয়নি। জঙ্গলের গল্প, জীবজগতের গল্প আর শিকার কাহিনী কিন্তু এক নয়, অকারণে বন্য পশু হত্যার গল্প শিশু কিশোরদের সামনে না দেওয়াই ভালো। এই ব্যাপারেও ময়ূখ চৌধুরীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে এই প্রতিবেদকের উদভ্রান্ত শিকারী এবং গল্পের চেয়ে ভয়ংকর লেখাগুলি রুদ্ধশ্বাসে পড়ে ফেলেছি। হ্যাঁ নিউজিল্যান্ডের জেমস ইংলিশ কার্যোপলক্ষে ভারতে এসে সাহাজানপুরের উত্তরের বনভূমিতে একটি বাঘ শিকার করেন এবং দ্বিতীয় বাঘটিকে শিকারের উদ্দেশ্যে অনুসরণ করে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসেন (উদভ্রান্ত শিকারী)। ফরাসী অধ্যুষিত হিভাওয়া দ্বীপে জেমস ফ্যালকনার সাদা বুনো কুকুরের মোকাবিলা করে মৃত্যুর দোরগোড়া থেকে ফিরে আসেন (গল্পের চেয়ে ভয়ঙ্কর)। গল্পগুলি শেষ করার পর বুকের মধ্যে মোচড় দেয় একটা অনুভূতি—ওই বাঘ বা বুনো কুকুরগুলির অপরাধটা কোথায়?

মরণ খেলার খেলোয়াড় এবং নয়টি ছুরির মালিক গল্পদুটি শেষ করার পর অবশ্য ওই খচখচানিটা হৃদয়ে তেমন মোচড় দেয়নি। দুর্ধর্ষ মাসাই যোদ্ধারা [illegible] সিংহটাকে হত্যা করেছিল ঠিকই, কিন্তু সে তো আগের রাত্রেই ওদের একটা পোষা ষাঁড়কে মেরে নিয়ে গেছে (মরণ খেলার খেলোয়াড়)। আমেরিকার অন্তর্গত কলোরাডো প্রদেশে শিকারী বিল ব্রায়ান্ট একটা পুমাকে ওই একই কারণে মারতে বাধ্য হয়েছিল (নয়টি ছুরির মালিক)।

শিবাজী পরবর্তী সময়ের মারাঠা নৌবহরের নেতা কহ্নোজী শঙ্খপাল ওরফে কহ্নোজী আংগ্রের প্রথম জীবনের এক রুদ্ধশ্বাস অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীকে ভিত্তি করে ময়ূখ চৌধুরী লিখেছিলেন "নায়কের জন্ম"। এই গল্পটিতে প্রসাদ রায় অলংকরণ করেননি ঠিকই, কিন্তু কহ্নোজী, তার বন্ধু বালাজী, সন্ন্যাসী ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী, খলনায়ক অচলাজী মোহিতে এবং সিদ্ধি ইয়াকুব খাঁদের চেহারা কেমন সেটি ময়ূখ চৌধুরী নিজেই জানিয়েছেন এই গল্প প্রকাশিত হবার বছর খানেক আগে। একই গল্প নিয়ে ময়ূখ চৌধুরী তৈরী করেছিলেন "দুরন্ত কাহিনী" নামে একটি কমিক্স, যেটি প্রকাশিত হয়েছিল দেব সাহিত্য কুটিরের পূজাবার্ষিকী বেনুবীণাতে।

একইভাবে একদা আর্যাবর্তে এবং শায়ক উপন্যাস হলেও তার কাহিনীগুলি নিয়ে ভিন্ন নামের কয়েকটি কমিক্স করেছিলেন ময়ূখ চৌধুরী। সময়টা যীশুখৃষ্টের জন্মের তিনশো বছর আগের ভারতবর্ষ। মগধের এক উচ্চাকাঙ্খী যুবক ছদ্মবেশে অরণ্যময় প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাঁর উচ্চাশা মগধের সিংহাসন দখল। জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে সে জড়িয়ে পড়ে নানান ঘটনায়। সে চন্দ্রগুপ্ত। পরবর্তী জীবনের মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। এই চন্দ্রগুপ্তকে নায়ক করেই ময়ূখ চৌধুরী লিখেছেন একদা আর্যাবর্তে এবং শায়ক। বিভিন্ন সময়ে সহচরিত্র হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন আলেকজাণ্ডার, সেলুকাস এবং আরো অনেকে। একই ঘটনা অবলম্বন করে চারটি কমিক্স তৈরী করেছিলেন [illegible] দেব সাহিত্য কুটিরের পূজাবার্ষিকী ইন্দ্রনীল ১৩৭৫), "আমি আগন্তুক" (কিশোর ভারতী, [illegible]), "বৈশাখী পূর্ণিমা রাতে" (কিশোর ভারতী, আশ্বিন ১৩৮০) এবং 'রাজকুমারের অসি" (দেব সাহিত্য কুটিরের পূজাবার্ষিকী মণিদীপা ১৩৮১)। অবশ্য কমিক্স থেকে উপন্যাসে রূপান্তরিত হবার সময় কিছু চরিত্র আমূল পাল্টে ফেলেছিলেন লেখক। বৈশাখী পূর্ণিমা রাতের প্রতোদ রাজ্যের রাজপুত্র রঞ্জুল একদা আর্যাবর্তে এসে হয়ে যায় বাহিলক রাজ্যের রাজকুমারী ছায়া। দুজনকেই খলনায়ক পিতৃব্যর কবল থেকে একই প্রক্রিয়ার রাজ্য উদ্ধার করতে হয়, শুধু বৈশাখী পূর্ণিমার বদলে সময়টা হয় ফাল্গুনী পূর্ণিমার রাত। এ ধরনের রদবদল লেখক আগেও করেছেন [illegible] কমিক্সএর পাতা থেকে দেবীদর্শন উপন্যাসে রূপান্তরিত হবার সময় হয়ে যায় ডাকাত রাণী দেবীচৌধুরাণী। বাকি ঘটনা থাকে প্রায় অপরিবর্তিত।

ইতিহাস ভিত্তিক কাল্পনিক গল্প লিখলেও ময়ূখ চৌধুরী ইতিহাসকে কখনো বিকৃত করেননি। বিশেষ করে অলংকরণের ক্ষেত্রে তো শতকরা একশো শতাংশ নিখুঁত না হলে সন্তুষ্ট হতেন না প্রসাদ রায়, সন্দেশে তখন 'একদা আর্যাবর্তে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল। একদিন জনৈক পাঠক এসে হাজির হলেন কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে নিউস্ক্রিপ্টের দোকানে। ওই পাঠক ছিলেন সন্দেশের একজন গ্রাহকের বাবা। বহুবছর ধরেই নিউস্ক্রিপ্ট থেকে সন্দেশের গ্রাহকেরা বই সংগ্রহ করে। সেই সময় নিউস্ক্রিপ্টের [illegible] ঐতিহাসিক সুকুমার ভট্টাচার্য ঘটনাটা শুনেছিলাম তাঁর মুখেই। সন্দেশের সেই গ্রাহকের অভিভাবক এসেই সুকুমারদার কাছে প্রচণ্ড বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য গল্পে যে ধরণের তরোয়ালের ছবি দেওয়া আছে, সেই ধরণের তরোয়াল ওই সময়ে ভারতবর্ষে দেখা যেত না। সুকুমারদা বিনীতভাবে বলেছিলেন, "আপনি দিনকয়েক পরে আরেকবার আসুন। প্রসাদবাবুকেও সেদিন আসতে বলব। আপনার প্রশ্নের উত্তর ভালোভাবে দিতে পারবেন তিনিই।"

ভদ্রলোক চলে যাবার একটু পরেই সেখানে হাজির হন প্রসাদ রায়। দুপুরের দিকে তিনি নিয়মিতই আসতেন

নিউস্ক্রিপ্টে, সুকুমারদার সঙ্গে আড্ডা দিতে। সুকুমারদার কাছে সব শোনার পর তাঁর মুখের ভাবে প্রচণ্ড পরিবর্তন হয়। কিন্তু কোনও কথা না বলে তখনই সেই স্থান ত্যাগ করেন এবং নির্দিষ্ট দিনে ওই পাঠক উপস্থিত হবার আগেই নিউস্ক্রিপ্টে এসে হাজির হন তিনি। যথাসময়ে এলেন সেই পাঠক। প্রাথমিক পরিচয়ের পরেই বিনা বাক্য ব্যয়ে কাগজকলম বার করেন প্রসাদ রায়। পরের তিন ঘণ্টায় সুকুমারদা এবং সেই পাঠক মুগ্ধ হয়ে শুনলেন এবং দেখলেন ভারতীয় অস্ত্রের ইতিহাস। প্রসাদ রায় একের পর এক এঁকে দেখালেন আর্যদের ভারতে আগমনের সময় থেকে অস্ত্রের বিভিন্ন চেহারা। ঘণ্টা তিনেক কাগজে কলমে অস্ত্র শিক্ষার পর মুগ্ধ সেই পাঠক নির্দ্বিধায় তাঁর ভুল স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

সুকমারদার কাছে তাঁর অলঙ্করণের নিখুঁত করার প্রয়াসের আরেকটি গল্প শুনেছিলাম। অন্য একটি পত্রিকায় সুকুমারদার মনোনীত একটি গল্পের (বিদেশী গল্পের অনুবাদ) জন্য ছবি আঁকতে গিয়ে অনেক খোঁজার পর পুরনো বইয়ের দোকান থেকে নিজের পকেট থেকে সাড়ে তিনশো টাকা খরচ করে একটা বই কিনেছিলেন। গল্পটির নায়ক ছিল চেকোশ্লোভাকিয়ার একটি বিশেষ প্রজাতির কুকুর। ওই কুকুরটির ফটোগ্রাফ ছিল সেই বইটিতে। কুকুরটির নিখুঁত ছবি আঁকার জন্য শিল্পী বিন্দুমাত্র ফাঁকি দিতে রাজি ছিলেন না।

কাল্পনিক চরিত্রের পরিবর্তনের অধিকার অবশ্যই আছে লেখকের। এই কাহিনীগুলি ইতিহাস নির্ভর কাল্পনিক গল্প। কিন্তু ইতিহাসকে কোথাও বিকৃত করেননি লেখক। গল্পগুলি পড়তে পড়তে আমরা যেন ঠিক পৌঁছে যাই সেই সময়ের ভারতবর্ষে। ভালবেসে ফেলি রঞ্জুল, ছায়া সবাইকেই।

লেখক ময়ূখ চৌধুরীর কৃতিত্ব সেখানেই।

JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register

শার্লকের ভূমিকায় যারা

অমিত দাস

কিংবদন্তী গোয়েন্দা শার্লক হোমসের গল্পের যত চিত্ররূপ হয়েছে পৃথিবীতে আর কোনো গোয়েন্দার ভাগ্যে সে রকম হয়েছে বলে শোনা যায়নি। ১৮৮৭ সালে বিটনস ক্রিসমাস এ্যানুয়ালে প্রকাশিত দুটি লাইন "in the year of 1878 I took my degee of Doctor of Medicine of the University of London and proceeded to Netley to go through the course prescribed for surgeons in the Army" সৃষ্টি করেছিল এমন দুই চরিত্রকে যারা ব্রেটেনের ত' বটেই বিশ্বের সাহিত্যেও সারা জীবনের জন্য অমর হয়ে থাকবেন শার্লক হোমস ও ডাক্তার ওয়াটসন।

শার্লক হোমসের ভূমিকায় বিশ্বেও অনেক বড় বড় অভিনেতা অভিনয় করেছেন। এই চিত্ররূপের অধিকাংশ কাহিনীই কোনান ডয়েলের রচিত গল্পের অপভ্রংশ বা adaptation। প্রথম হোমসের ভূমিকায় [illegible] স্ক্রীনে অভিনয় করেন আমেরিকার অভিনেতা উৎয়াম জিলেট। তাঁর সঙ্গে কনান ডয়েল-এর কো বন্ধুত্বও ছিল। যে সব নামজাদা ব্রিটিশ ও হলিউড তারকারা অভিনয় করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—আর্থার ওয়ান্টনর (১৯৩১-৩২, ১৯৩৫ ও ১৯৩৭), জন ব্যারিমোর (১৯২২), মাইকেল কেন (১৯৮৮), জেমস বণ্ড ফিল্মের "Q" জন ক্লিস (১৯৭৩ ও ১৯৭৭), ড্রাকুলা খ্যাত পিটার কুশিং (১৯৫৯, টিভি সিরিয়ালে ১৯৬৫-৬৮ এবং ১৯৬৪), বেনহুর খ্যাত টার্লটন হেসটন (১৯৯১ একটি টেলিফিল্মে), পিটার ও'টুল (১৯৮৩), সাউণ্ড অফ মিউজিকের ক্যাপটেন ভন ট্রাপ-ক্রিসটোফার প্লামার) ১৯৭৭ ও ১৯৭৮), জেমস দ'আর্সি (২০০৩) এবং সর্বশেষ রবার্ট ডাউনি জুনিয়র (২০০৯)। শেষ ছবিটি একত্রে মুক্তি পায় ২৬শে ডিসেম্বর ২০০৯ ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকাতে। এই ছবিতে শার্লক হোমস ও ওয়াটসন ছাড়াও রয়েছেন স্বয়ং প্রফেসর মরিয়ার্টি, আইরিন এ্যাডলার, লর্ড ব্ল্যাকউড এবং যথারিতী ইন্সপেক্টর লেস্ট্রেড। ওয়াটসনের চরিত্রে ছিলেন বিখ্যাত অভিনেতা—জুড ল। আগেই বলেছি এদের মধ্যে অধিকাংশ গল্পই কাল্পনিক-আর্থার কোনান ডয়েলের রচিত নয়।

স্যার কোনান ডয়েলের রচিত শার্লক হোমসের কাহিনীতে শার্লকের ভূমিকায় অভিনয় সবচেয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন দুই বিখ্যাত অভিনেতা-স্যার বেসিল র‍্যাথবোন ও জেরেমি ব্রেট।

স্যার বেসিল র‍্যাথবোন (১৮৯২-১৯৬৫) হোমসের ২৪টি কাহিনীতে [illegible] ছিল ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৬। স্যার বেসিলের সঙ্গে ডক্টর ওয়াটসনের ভূমিকায় অভিনয় করেন উইলিয়াম নাইজেল আর্নেল ব্রুস (১৮৯৫-১৯৫৬) বা সংক্ষেপে নাইজেল ব্রুস। নাইজেলের ওয়াটসনকে অনেক দর্শক মেনে নিতে পারেননি কারণ তিনি ওয়াটসনকে এক ধুড়ধুড়ে বুড়ো বা ভাঁড় বানিয়েছিলেন।

তবে সফলভাবে কেউ যদি হোমসকে সারা দুনিয়ার দর্শককদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলে থাকেন তা হলে একজনের নামই করতে হবে। তিনি হলেন জেরেমি ব্রেট (জন্ম ৩রা নভেম্বর ১৯৩৩-মৃত্যু ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৫)। শার্লকের ভূমিকায় যত জন অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়।

সবচেয়ে সত্যের কথা বলতে ব্রেট তাঁর পিতৃদত্ত পবদী নয়। তাঁর আসল নাম পিটার জেরেমি উইলিয়াম হাগিন্স। জেরেমির জন্ম ইংল্যাণ্ডের বার্কসওয়েলে। তাঁর পিতা লর্ড লেফটেনেন্ট অফ ওয়ারউইকশায়ার এবং মা এডিথ ক্যাডবেরী বাটলার হাগিন্স-নাম শুনেই বুঝতে পারছ যে এডিথ ছিলেন বিশ্ব বিখ্যাত চকোলেট প্রস্তুতকারক ক্যাডবেরী পরিবারর সদস্যা। জেরেমির বাবার মোটেও ইচ্ছা ছিল না যে ছেলে অভিনেতা হয়। তাই তিনি থিয়েটারে আসার জন্য তিনি ব্রেট পদলী ধার করেন। এই ব্রেট কে ছিলেন জান? জেরেমির প্রথম স্যুট তৈরী করেন ব্রেট এ্যাণ্ড কোং, নিজের স্যুটের লেবেল থেকে জেরেমি তাঁর পদবী ধার করেন।

[illegible] তৈরী হলিউডের বিশ্ব বিখ্যাত ছবি "মাই ফেয়ার লেডি" দেখেছ সেখানে জেরেমির অভিনয় কি তোমাদের মনে আছে? সেই ছবিতে জেরেমি ফ্রেডি আইন্সফোর্ডের ভূমিকায় অভিনয় করেন, বিপরিতে ছিলেন কিংবদন্তী অস্কার বিজয়ী অভিনেত্রী অড্রে হেপবার্ণ। সিনেমাতে জেরেমির একটি গানও ছিল যদিও সেটা পরে স্টুডিওতে ডাব করা হয়।

জেরেমি যত সিনেমা ও নাটকে অভিনয় করুন না কেন, লোকে তাকে মনে রাখবে গ্রানাডা টেলিভিশন প্রযোজিত শার্লক হোমসের অ্যাডভেঞ্চারস বা শার্লক

JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register

হোমসের কাণ্ডকারখানার জন্য। ১৯৮৪ থেকে ১৯৯৪ জেরেমি ব্রেট ৪১ টি হোমস কাহিনীচিত্রে অভিনয় করেন।

মজার কথা হল এই জেরেমি ব্রেটকে গ্রানাডা টেলিভিশন প্রথম হোমস করতে বলেন ১৯৮২ সালে। জেরেমি সরাসরি না বলে দেন। ১৯৯১ সালে একটা রেডিও ইন্টারভিউতে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জেরেমি বলেন—আমি ও আমার ছেলে ডেভিড গিয়েছিলাম। আমি হোমস করতে অসম্মত হই। হোমস ত এতবার করা হয়ে গিয়েছে। ডেভিড আমাকে বলল—বাবা তুমি হোমস করবে না? আমি বললাম—না।

পরে অবশ্য কোনান ডয়েলের লেখা শার্লক হোমসের সবকটা গল্প পড়ার পর জেরেমি তাঁর মনত পাল্টান। ডয়েলের লেখা হোমসের সমস্ত খুঁটিনাটি নিয়ে নিজে একটি ফাইল বানিয়েছিলেন হোমসের ওপর। সেখান থেকেই তিনি হোমসের বিভিন্ন ম্যানারিজমস-এর হদিস পান, যেমন হাতের ভঙ্গিমা, হঠাৎ হেসে ওঠা, ইত্যাদি। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে যতবার জেরেমিকে প্রশ্ন করা হয়েছে—এই যে আপনার বসার স্টাইল, আঙুল দিয়ে পিরামিড বানান, [illegible] একটাই উত্তর It's all Doyle-সব ডয়েলের লেখা। জেরেমি সবসময় চাইতেন যে তাঁর করা শার্লক যেন হুবহু কোনান ডয়েলের মত হয়। এই নিয়ে চিত্রনাট্যকারদের সঙ্গে জেরেমির কম মনোমলিন্য হয়নি এবং গ্রানাডা টেলিভিশনকে এইসব ব্যাপারে মধ্যস্থকারির ভূমিকা পালন করতে হত।

এইবার তোমাদের একটা আশ্চর্য্যের কথা বলি। ১৯৮০ সালে লস এ্যাঞ্জেলেসে মঞ্চে জেরেমি ব্রেট ডক্টর ওয়াটসনের ভূমিকায় অভিনয় করেন। শার্লকের চরিত্রে ছিলেন প্রবাদপ্রতিম হলিউড অভিনেতা, বেন হুর খ্যাত চার্লটন হেস্টন। নাটকটির নাম The [illegible] Blood। এর ফলে জেরেমি হলেন তৃতীয় অভিনেতা যিনি হোমস ও ওয়াটসনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। জেরেমি ব্রেট ছাড়া এই কৃতিত্বের অধিকারি হলেন—রেডিনাল্ড ওয়েন (ওয়াটসন ১৯৩২ শার্লক ১৯৩৩) ও প্যাট্রিক ম্যাক্‌নি (ওয়াটসন ১৯৭৬ ও শার্লক ১৯৯৩)।

জেরেমি তাঁর পাশে ওয়াটসন হিসাবে পেয়েছিলেন দুই খ্যাতনামা অভিনেতাকে—ডেভিড বার্ক ও এডওয়ার্ড হার্ডউইক। জেরেমি ও ডেভিড একত্রে ১৩টি এপিসোডে কাজ করেন। তরপর ডেভিড বাড়ি ফিরে যান—তাঁর দু বছরের শিশুপুত্র টমের সঙ্গে সময় কাটাবেন বলে। আসেন এডওয়ার্ড হার্ডউইক ওয়াটসন করতে। এডওয়ার্ড ওয়াটসন করার আগে মন দিয়ে আগের সব কটা এপিসোড দেখেন—তারপর নিজের উচ্চতা বাড়াতে মাথায় চুপি ও [illegible] জুতো নিয়েই ঘটে যায় এক মজার কাণ্ড। জেরেমির জবানিতে সেটা শোনা যাক—তখন The Abbey Grange এর শ্যুটিং চলছিল—এবং শটটা ছিল মাঠের ওফর দিয়ে দৌড়ে যাওয়া। এডওয়ার্ড ত ওই ফসল হীল পরে স্লিপ করতে করতে ছুটলেন, তাই দেখে সবার কি হো হো করে হাসি। আমি বললাম এডওয়ার্ড প্লিজ, ওই জুতো খেলো, আমি হাঁটুদুটো বেঁকিয়ে বাকি ফিল্মটা অভিনয় করব।

১৯৯১-এর রেডিও ইন্টারভিউতে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জেরেমির অকপট স্বীকারোক্তি—এক একটি চরিত্র অভিনেতোকে গ্রাস করে নেয়। যখন এটা হয় তখন অভিনেতা হয়ে যায় একটা স্পঞ্জ—সে নিজের সত্ত্বাকে নিঙড়ে বের করে দেয়, তারপর সেই [illegible] শুষে নেয়। জেরেমি অভিনয়ের ব্যাপারে ছিলেন প্রচণ্ড প্যাশানেট। তাঁর অভিনয় দেখলেই সেটা বোঝা যায়। নিজের শরীরের ওপর কোনো আঘাতের পরোয়া না করে তিনি ফার্নিচারের ওপর দিয়ে লাফিয়ে যেতেন কি ব্রীজের ওপর থেকে নীচে লাফিয়ে পড়তেন।

হোমসের পার্সোনালিটি ধীরে ধীরে জেরেমিকে গ্রাস করে ফেলছিল। কাজ ছেড়ে তিনি একদম থাকতে পারতেন না। শটের ব্রেকের মাঝে না খেয়ে স্ক্রিপ্ট নিয়ে বসে থাকতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল যে বেশিদিন শার্লক হোমসের চরিত্র কেউ করলে, হোমসের আত্মা তাকে গ্রাস করে নেবে। জেরেমি কালান্তক minic depression-এ আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে করেন—The Sign of Four। শেষের দিকে সেটে নিঃশ্বাসের কষ্ট হলে তাঁকে অক্সিজেন দিতে হত, তাও তিনি অভিনয় বন্ধ করতেন না। তাঁর প্রিয় লাইন ছিল—"Darling, the show must go on"।। শেষ সিরিজটি শেষ করার অল্প দিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register

কার্টুনিস্ট লক্ষ্মণ

দেবাশীষ দেব

মুম্বাই শহরের রীতিমত নামজাদা আর্ট কলেজ 'জে. জে স্কুল অফ আর্ট'-এর বার্ষিক অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হয়ে এসেছেন বিখ্যাত একজন কার্টুনিস্ট যিনি বক্তৃতা দিতে উঠে হল ভর্তি লোকের সামনে ঠাট্টার ছলে ফাঁস করে দিলেন যে আজ এত সম্মান জানানো হলেও কোনও এক সময় ওই কলেজ কর্তৃপক্ষ কিন্তু তাঁর কাজ দেখে তাঁকে ছাত্র হিসেবে ভর্তি করার ব্যাপারে যথেষ্ট যোগ্য মনে করেনি।

ঠিক এই রকমটাই যে ঘটেছিল রসিপুরম, কৃষ্ণস্বামী, লক্ষ্মণের জীবনে এটা জানা যায় তাঁর লেখা 'THE TUNNEL OF TIME' বইটা পড়ে, সবার কাছ আর, কে, লক্ষ্মণ নামে পরিচিত ভারতবর্ষের সর্বকালের সেরা এই কার্টুনিস্ট জন্মেছিলেন মাইসোর শহরের এক শিক্ষিত পরিবারে, ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে। বাবা ছিলেন স্থানীয় স্কুলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ হেডমাস্টার, তবে ছ'ভাইয়ের মধ্যে সব থেকে ছোট লক্ষ্মণের ছেলেবেলা থেকেই লেখাপড়ার চাইতে ছবি আঁকায় মন ছিল অনেক বেশি— মাঝে মাঝেই বন্ধুদের নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন শহরের আশেপাশে গিয়ে ল্যান্ডস্কেপ পেন্টিং করতে। হাইস্কুলে ওঠার পর ছবি এঁকে, ইলাস্ট্রেশন করে টুকটাক রোজগার হচ্ছে—স্বপ্ন দেখেন একদিন বড় কোনও আর্ট কলেজে ভর্তি হবেন, অনেক আশা করে ছবিও পাঠালেন 'জে. জে'তে, কিন্তু সরাসরি নাকচ হয়ে গেলেন। কী আর করা মাইসোরেই গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে কিছুদিন মাদ্রাজে (এখন চেন্নাই) গিয়ে অ্যানিমেশন স্টুডিওতে কাজ করলেন—এদিকে মাথায় তখন পলিটিক্যাল কার্টুনিস্ট হবার চিন্তা ঘুরতে শুরু করেছে, ফলে সব ছেড়ে ছুড়ে পাড়ি জমালেন একেবারে রাজধানী দিল্লি শহরে। প্রভাবশালী দিদি, জামাইবাবুর কাছে থেকে যোগাযোগ হল বহু খবরের কাগজের লোকজনের সঙ্গে, তবু দিল্লিতে ঠিক সুবিধে হল না। ঠিক করলেন মাইসোরেই ফিরে যাবেন, পথে শুধু বোম্বে শহরটা দেখে নিয়ে। প্রথম দর্শনেই প্রাণচঞ্চল বোম্বে ভাল লেগে গেল লক্ষ্মণের আর এমনই কপাল পলিটিক্যাল কার্টুন আঁকার একটা চাকরিও জুটে গেল এখানকার 'ফ্রি প্রেস জার্নাল' কাগজে তারপর সেটা ছেড়ে দিয়ে সোজা ভারতবর্ষের অন্যতম বৃহৎ সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান টাইমস অফ ইণ্ডিয়া-তে গিয়ে ঢুকলেন এবং এখানে কাজ করতে করতেই কার্টুনিস্ট হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেললেন লক্ষ্মণ। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে একটানা এই কাগজের জন্য কাজ করে গিয়েছেন তিনি। এর মধ্যে পাঠক বোধহয় সব থেকে বেশি মনে রাখবে তাঁর প্রথম পাতার দৈনিক পকেট কার্টুন 'YOU SAID IT' সিরিজটাকে। এখানে অসম্ভব মজাদার সমস্ত সিচুয়েশনকে প্রতিটি ছবির মধ্যে এনে তিনি ক্রমাগত সোচ্চার হয়ে উঠেছেন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক এবং সামাজিক স্তরের যাবতীয় দুর্নীতি আর অব্যবস্থার বিরুদ্ধে। মন্ত্রি, নেতা, অফিসর, প্রোফেসর, ক্রিকেটার কেউই রেহাই পাননি লক্ষ্মণের সরস অথচ তীব্র সমালোচনার হাত থেকে। কোনওদিন, কোথাও আঁকা না শিখেও 'HUMOROUS DRAWING' টাকে দারুণভাবে রপ্ত করেছিলেন তিনি তুলি দিয়ে আঁকা সমস্ত কার্টুনের মধ্যে। জিটলিং-এর

JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register

কাজগুলিও সত্যি দেখবার মতো—সেই সঙ্গে সামান্য কয়েকটা টানে প্রতিটা ক্যারেকটারের মুখের ভাব কিংবা বডি ল্যাংগোয়েজকে তিনি ফুটিয়ে তুলতে পারেন নিখুঁতভাবে। প্রতিটি কার্টুনের সঙ্গে আবার বেশ রসিয়ে একটা ক্যাপশন-ও জুড়ে দেওয়া থাকে, যা মূল বিষয়টাকে খুব সহজে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয়।

তবে লক্ষ্মণের কার্টুন নিয়ে কোনও আলোচনাই পুরো হয়না সেই অর্ধেক টাক-অর্ধেক পাকা চুলওয়ালা, ধুতি-কোট গায়ে ছাপোষা, নিরীহ আধবুড়ো লোকটাকে ছাড়া, সমস্ত কার্টুনপ্রেমী মানুষের কাছে যিনি 'COMON MAN' হিসেবে পরিচিত। লক্ষ্মণের সব কার্টুনেই তিনি চশমার মধ্যে দিয়ে গোলগোল চোখে সব কিছু দেখছেন, শুনছেন কিন্তু কোনওরকম মন্তব্য করছেন না। লক্ষণের কথায় এই লোকটি হলেন ভারতবর্ষের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের একজন, যে কিনা দিনের পর দিন মুখ বুজে যাবতীয় অত্যাচার সহ্য করে যেতে বাধ্য হয়।

কার্টুনের পাশাপাশি অজস্র বিখ্যাত মানুষের ক্যারিকেচার করেছেন লক্ষ্মণ—একবার টাইমস অফ ইণ্ডিয়া থেকে তাঁকে ইংলণ্ডে পাঠানোই হয় ওখানকার কিছু গুণিজনের সঙ্গে আলাপ করে তাদের ছবি এঁকে আনার জন্য। সেই

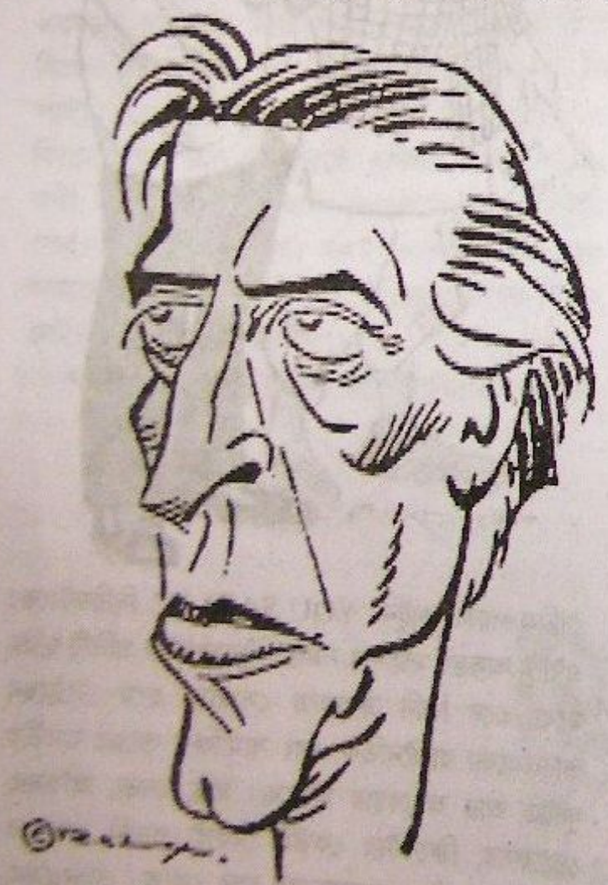

মতো লক্ষ্মণ তো গিয়ে হাজির হয়েছেন লণ্ডনের 'রিচমণ্ড' অঞ্চলে—মহান দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের বাড়ি—কথাবার্তা, ছবি আঁকা সব হল, সরঞ্জাম গুটিয়ে লক্ষ্মণ

A hair cut and a shave?— What's the matter—giving up painting?

উঠে আসবেন—চেয়ারে বসে পাইপে তামাক ভরতে ভরতে হালকা চালে ব্রার্ট্রাণ্ড সাহেব বললেন, 'তোমরা ভারতীয়রা কিছুই আবিষ্কার করতে পারোনি। এইরকম একটা আকস্মিক মন্তব্যে লক্ষ্মণ মনে মনে বেশ চটলেন—সাহেব আবার বলেন—'একেবারে কিস্যু না, 'A BIG ZERO'! ঠোঁটের কোণায় পাইপটাকে চেপে ধরে রেখেছেন আর চোখে মিটিমিটি হাসি—লক্ষ্মণ আবার সোফায় বসে পড়লেন, এর একটা প্রতিবাদ তো করতেই হয়, বেশ উঁচু গলায় বলতে শুরু করলেন—"কেন দাবা? দাবা কারা আবিষ্কার করেছিল? দর্শন, শাস্ত্র, সাহিত্য, ক্লাসিকস.....?"

সাহেবের [illegible] "CALM DOWN, YOUNG MAN.....' আমি তো তোমাদের আসলে বিরাট কমপ্লিমেন্ট দিচ্ছি—এই যে 'শূন্য'র কনসেপ্ট, অঙ্কের ক্ষেত্রে এটা তো এক বিরাট আবিষ্কার, যার পুরো কৃতিত্বই ভারতীয় চিন্তাবিদদের, আমি তো নিজেই ভারতীয় দর্শনের ভীষণ ভক্ত। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মত অত বিরাট মাপের মানুষটি সে যাত্রায় সত্যিই মুগ্ধ করেছিল লক্ষ্মণকে।

কার্টুনের পাশাপাশি লক্ষ্মণ সময় পেলেই তাঁর খুব পছন্দের প্রাণী কাকের ছবি এঁকেছেন, তিনি বলতেন

কাকের সাদা-কালো মেশানো রংটা যে কোনও ব্যাকগ্রাউণ্ডের ওপরই খোলে ভালো, তাছাড়া পাখিদের মধ্যে কাক-ই হল সব থেকে বুদ্ধিমান, ময়ূর নয় বরং কাককেই ভারতের জাতীয় পাখি করা উচিৎ।

কার্টুনিস্ট হিসেবে পদ্মবিভূষণ কিংবা বিদেশের ম্যাগসাইসাই-এর মত দুর্লভ পুরস্কার [illegible] পেয়েছেন লক্ষ্মণ, তবে [illegible] বোধহয় তাঁকে দেওয়া হয়েছে খোদ টাইমস অফ ইণ্ডিয়া থেকেই—অফিস ছেড়ে দেবার পর তাঁর ঘরটা বন্ধ রেখে, আজ অবধি অন্য কাকে ব্যবহার করতে না দিয়ে।

লেখালিখির ব্যাপারেও যথেষ্ট উৎসাহ ছিল লক্ষ্মণের, অজস্র ছোট গল্প, প্রবন্ধ আর 'ট্র্যাভেলগ' লিখে গিয়েছেন তিনি। 'IDLE HOUR' কিংবা 'THE MESSENGER'-এর মত গল্প সংকলন বা উপন্যাসও বই হয়ে বেরিয়েছে—এ ছাড়াও তাঁর কার্টুন এর ঢাউস

Yes, I work in the meteorological department—how did you know?

Gandhiji, Sir....

ঢাউস সমস্ত সংগ্রহ প্রকাশিত হয়ে চলেছে নিয়মিত। জীবনটাকে কাজের মধ্যে দিয়ে চুটিয়ে উপভোগ করেছেন লক্ষ্মণ—সেই সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছেন। পৃথিবীর নানা দেশে।

২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ার পর থেকে অবশ্য কাজ করার ক্ষমতা অনেকটাই হারিয়ে ফেলেন তিনি—সম্পূর্ণ পঙ্গু হয়ে যাওয়া একটা পা-কে দেখিয়ে দুঃখ করে বলেছিলেন—এই পা আমাকে কত জায়গায় নিয়ে গিয়েছে—এমনকি চিনের বিরাট পাঁচিলের ওপরেও হেঁটেছি এই পায়ের ওপর ভর দিয়ে, অথচ আজ এটা একেবারে অকেজো হয়ে পড়ে আছে।"

বর্তমানে লক্ষ্মণ এতটাই অসুস্থ যে, মনে হয়না আর কোনওদিন তিনি তুলি ধরতে পারবেন—ওই 'COMMON MAN'-এর মতো হয়ত বাকি জীবনটা চারপাশের সব ঘটনা শুধু নীরবে দেখেই কাটিয়ে দেবেন কার্টুন এঁকে প্রতিবাদ করা আর হয়ে উঠবে না।

কার্টুন : আর. কে. লক্ষ্মণ

JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register

সব হতে আপন

অমিতাভ চৌধুরি

হায় রে, সেকাল হায় রে! গত দিনের জন্য হা হুতাশ প্রায় সকলেরই। আমরা, যারা এককালে শান্তিনিকেতনে পড়তাম, আমাদের অনবরত হা-হুতাশ সেকালের [illegible] শান্তিনিকেতনের জন্য।

গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি আমি শান্তিনিকেতনে [illegible] আকাশ সবচেয়ে রঙিন। রবীন্দ্রনাথ সবে অস্তমিত এবং রবি অস্ত গেলেই তো আকাশ সবচেয়ে রঙিন হয়ে ওঠে। শান্তিনিকেতনে তাই হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সশরীরে না থাকলেও তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি সব সময় ছিল। শুধু তাই নয়, তাঁর ঘনিষ্ঠজনেরা তখন শান্তিনিকেতনের হাল ধরে আছেন। আছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রতিমা দেবী, প্রমথ চৌধুরী, ইন্দিরা দেবী, অনিলকুমার চন্দ, রানি চন্দ, মীরা দেবী, নন্দিতা দেবী, কৃষ্ণ কৃপালনি, ক্ষিতীশ রায়, নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর, রামকিঙ্কর বেইজ, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, শৈলজা মজুমদার, শান্তিদেব ঘোষ, অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়, জাহাঙ্গির ভাওল, কান্তিচন্দ্র ঘোষ, তান উন সা, [illegible] ত্রিবেদী, প্রবোধচন্দ্র সেন, সুনীল চন্দ্র সরকার, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মুকুল দে, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রসাদজীবন চৌধুরী, ডঃ প্রবোধ চন্দ্র বাগচি, বিধুশেখর শাস্ত্রী—কত নাম বলবো। সব মিলিয়ে বিরাট এক আনন্দের সংসার।

সে সময় শান্তিনিকেতনে নাচগান বাজনা আঁকা মূর্তিগড়া সবই ছিল, তবে বেশি ছিল রসিকতার চর্চা। কোন ছাত্র বা অধ্যাপক এলে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতো, উনি রসিকতা বোঝেন তো? বুঝলে তৎক্ষনাৎ শান্তিনিকেতনী হয়ে গেলেন। রসিকতার রাজা ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, সুতরাং তাঁর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে রসিকতা চর্চা না হলে চলবে কেন?

রসিকতার সেরা ছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন। তখন তিনি বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ। প্রতি বুধবার মন্দিরে উপাসনা পরিচালনা করতেন। কিন্তু তার বাইরে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি গোটা শান্তিনিকেতনে জমিয়ে রাখতো।

কে একজন ক্ষিতিমোহনবাবুকে এসে বললো, মুকুল দে'কে নিয়ে আর পারা যায় না, সেদিন ভদ্রলোকের কথা শেষ হবার আগেই ক্ষিতিমোহন বললেন, মুকুলের কথা বলছেন তো? ঠিকই বলছেন ওর মূলের মাঝখানেই 'কু', সুতরাং ভালো হইব কী কইর‍্যা!

ক্ষিতিমোহনবাবুর স্ত্রীকে সবাই 'ঠানদি' ডাকতো। কোন এক নাটকে ক্ষিতিমোহনবাবু ঠাকুরদার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, তারপর থেকেই তিনি ঠানদি। তাঁর সম্পর্কে কেউ কোন মন্তব্য করলে তার ক্ষিতি মোহন বাবু বলে ওঠেন, "ঠিকই [illegible] বড়ই তিরিক্ষি। বাইরে রোগা কিন্তু ভেতরে দারোগা।" ক্ষিতি মোহন বাবুদের পৈত্রিক বাড়ি [illegible]। কিন্তু কেন কবিরাজি করবেন না, জানতে চাইলে তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন "ইচ্ছে তো ছিল, কিন্তু কবি রাজি হলেন না।"

এই হচ্ছেন ক্ষিতিমোহনবাবু, পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সরসতার এমন সংমিশ্রণ কদাচিৎ দেখা যায়। আর শান্তিনিকেতন জায়গাটা এমন ছিল যে, রসিকতার চর্চা না করলে সেখানে বাস করাই কঠিন হয়ে পড়তো। রসিকতার ব্যাপারে উজ্জ্বল ছিলেন অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন। কথায় কথায় ছিল সরস ফুলঝুরি। আমাদের মধ্যে উজ্জ্বল ছাত্র ছিল সোফাইল হায়দর চৌধুরী, সে প্রবোধদার ছাত্র। তিনি তাকে ডাকতেন 'মুখোজ্জ্বল' বলে। প্রবোধচন্দ্র সেনেরই আর [illegible] অধ্যাপক অমিয়কুমার সেনও ছিলেন কথার রাজা। পশ্চিমবঙ্গে নতুন মন্ত্রিসভায় এসেছেন কালীপদ মুখোপাধ্যায়, যাদবেন্দ্র পাঁজা প্রমুখ। পাঁজা মশাই জুতো পরতেন না। অমিয় সেন তাঁর নাম দিয়েছিলেন খালিপদ পাঁজা।

তখন 'দেশ' পত্রিকায় সাপ্তাহিক বেরোচ্ছে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা, ইন্দ্রজিতের খাতা, সুনীলচন্দ্র সরকার তাঁর লেখা 'কালোর বই' পড়ে শোনালেন আমাদের সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্তর ছোট ছোট কবিতা ছাপা হচ্ছে কাগজে। তাঁর লেখা বই 'সোহিনী চমৎকার। সুনীলদার লেখা 'জামতলা' কবিতাটিতে অতি বিখ্যাত হয়ে আছে, হিন্দি ভবনের পাশে তাঁর বাড়ির সামনে সেই জামগাছ। তাকে নিয়েই এই লেখা। আমি যখন শান্তিনিকেতন যাই, গাছটা দেখে আমি [illegible] দা নেই, কিন্তু সেই 'জামতলা' আছে।

আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন অনিলকুমার চন্দ। ছাত্রবৎসল, রসিকতার রাজা এবং বিশ্বভারতীর অন্যতম পরিচালক। আমরা বলতাম শান্তিনিকেতনে তখন অ-সু-র রাজত্ব চলছে। অনিল সুরেন ও রথী মিলেই অসুর, সেই অনিলদা স্ত্রী রানি চন্দ ও পুত্র অভিজিৎসহ থাকতেন উত্তরায়নের ভেতরে কোনার্কে। মাঝে মাঝে ছাত্রসংযোগ বাড়াতে আমাদের কলেজ হস্টেলে এসেও থাকতেন।

অনিলদার কোনার্ক বাড়িতে আমাদের নিয়মিত যাতায়াত ছিল। রানিদি রাগ করছেন আর লিখছেন। তাঁর সব বই-ই সমাদৃত হচ্ছে পাঠকমহলে। তাছাড়া ছবি আঁকায়

JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register

মাধবীও হতে পারে, ঝিমের ঘোরে ঠিক ঠাহর করতে পারি নি। সাহেব কলিং বেল বাজাতেই সাহেবের বউ ঘর থেকে কি একটা বলতে বলতে গ্রিলের দরজার চাবি খুলে দিল। টুকটাক কিছু কথা চলতে চলতে 'সাহেব' অফিসের ব্যাগ থেকে খবরের কাগজ, টিফিন বাক্স, মানি ব্যাগ সব বার করার পর বউকে ডেকে বললে, এই নাও তোমার ট্যাড়সের বীজ, সময় পেলে লাগিয়ে দিও।' তখনকার মত এবাড়ির ফোনের টেবিলের পাশের জানলার ধাপে আমাদের ঠাঁই হ'ল।

এই বাড়িটাতে বাস করে মাত্র দুটি প্রাণী,—সাহেব আর তার বউ। তাদের একটিই ছেলে, বড় হয়ে গেছে, এখন বম্বেতে কাজ করে। এছাড়া নিত্যি আসে মীনাদি আর রেণুদি। ছুটি ছাটার দিনে পাড়ার দুটি বাচ্চা, পরাগ আর সোমেরও এখানে অবাধ আনাগোনা। তাদের একজনের বয়স পাঁচ বছর আর অন্য জনের ওরই কাছাকাছি। তারা সাহেব আর তার বউকে বলে 'সুপুরি দাদু' আর 'পান দিদু'। তাই দেখে আমিও ভাবছি ওদের দাদু, দিদু বলেই ডাকব।

প্রতি রবিবার এবাড়িতে আসে কেষ্টদা। আমরা এই বাড়িতে আসার পরের দিনটাই ছিল রবিবার, ফলে সকাল সাড়ে ছ'টা না বাজতেই কেষ্টদা হাজির। দাদুর কথা মত ও বাড়ির সামনের বাগানের বেশ কিছুটা জমি কুপিয়ে, ঘাস আর পাথর বেছে, ঢ্যালা ভেঙে ঝুরঝুরে করে, হাত দিয়ে মাটি সমান করে দিয়ে গেল। শুনলাম এসবই নাকি আমাদের জন্য হচ্ছে। কিন্তু সেদিন সকলের নানা কাজ থাকায়, কারুরই আর বীজ লাগানোর সময় হ'ল না।

আমরা কদিন ফোনের কছেই ছিলাম বলে আস্তে আস্তে এবাড়ির অনেক খবর জেনে গেলাম। দাদুদের বাড়িতে বেশ কিছু বছর ধরে দোলের দিনে গান বাজনা হয়। এবারেও হবে। দিদুর ছোট পিসিমা বয়সে সকলের বড় তাই ফোনে ফোনে ওনার নেমন্তন্নটা হয়ে গেল সবার আগে। আরো অনেক আত্মীয় বন্ধুরাও আসবেন। আর সবার শেষে হবে ভূরিভোজ। এবারের মেনু ঠিক হ'ল 'কচি পাঁঠার' ঝোল আর ফুলকো লুচি। তার সঙ্গে থাকবে 'লেজ সুদ্ধ' লম্বা লম্বা বেগুন ভাজা আর টমেটোর চাটনি। শেষ কালে অবশ্য রাজভোগ আর পান খাল চাই—।

দেখতে দেখতে আর একটা রবিবার এসে গেল। দুপুরের ঘুম সেরে, দাদু আর দিদু আমাদের নিয়ে বাগানে চলে এল। দিদুর কোমরে বড্ড ব্যথা বলে, নিচু হয়ে করার কাজগুলো সাধারণতঃ দাদুর ভাগেই পড়ে, কাসেম ভাই এর কথা মত দাদু একহাত দূরে দূরে আমাদের এক এক জনকে কেষ্টদার করা সুন্দর ঝুরঝুরে মাটির তলায় ঢুকিয়ে, ওপরটা একটু চেপেচুপে দিল, যাতে মাটিটা আমাদের গায়ের সঙ্গে বেশ সেঁটে যায়। সেদিন অর্ধেক বীজ লাগতে না লাগাতেই সন্ধে নেমে এলো। আর অমনি আদাড় বাদাড় থেকে মশার দল পিঁ পিঁ করে বেরিয়ে এলো। সন্ধের সময়টা ওদের যেন বড্ড খিদে পায়। তখন ওরা কেবল [illegible] খায় আর মানুষের সারা গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। ওরা বাগানের গাছেদেরও কামড়াতে ছাড়ে না। তবে তাদের গায়ে তো আর তোমাদের মত রক্ত নেই তাই ম্যালেরিয়া হওয়ার ভয়ও নেই। মশার কামড়ে টিকতে না পেরে দাদু সোজা ঘরের ভেতরে পালাল। এবারে দিদুর পালা—দিদু জলের পাইপ দিয়ে আলতো করে আমাদের মাটির ওপরে জল ছিটিয়ে দিল। শুকনো মাটিতে জল পড়ামাত্র শোঁ শোঁ করে মাটির ফাঁক দিয়ে সেটা নিচে নেমে এলো আর তখন কী অপূর্ব্ব একটা মিষ্টি সোঁদা সোঁদা গন্ধ বেরুতে লাগল, কি বলব! সেই জল আমার গায়ে এসে লাগতেই কী যে আরাম হ'ল সে আর বলে বোঝাতে পারব না। এতদিন [illegible] যাচ্ছিল, কত মাস পরে আবার একটু জল পেলাম। আনন্দে আত্মহারা হয়ে সারা শরীর দিয়ে চেটে চেটে যতটা পারি জল খেয়ে নিলাম। আঃ কী শান্তি। আমার শরীরের ভেতরে জল ঢোকা মাত্র কি যেন একটা সাড়া পড়ে গেল।

৫

প্রাণভরে জল খাবার পর প্রায় একটা দিন কেটে গেল। চার দিকে সব চুপ—। এবার আমার বীজের ভেতর থেকে একটু একটু ক'রে প্রথমে আমার ঠ্যাং তারপরে আমার মাথা উঁকি দিতে আরম্ভ করল। এতদিনে সত্যিই আমার ঘুম ভাঙলো। আর আমাকে থামায় কে রে?

তোমরা যেটাকে ঠ্যাং বা পা বল, সেটাই [illegible] আমাদের ভ্রূণ মূল আর যেটাকে তোমরা গা বা মাথা বল, সেটা হল আমাদের ভ্রূণমুকুল। জলটল পেয়ে তারা এবরে তরতর করে বাড়াতে আরম্ভ করল। মাটির তলায় আমাদের ভ্রূণমূল তখন 'মূল' হয়ে গেছে, সেটা ক্রমশ একটা থেকে দুটো, দুটো থেকে তিনটে এইভাবে সংখ্যায় বাড়তেই থাকল। আমরা তো তোমাদের মত দু-পেয়ে নই আর দৌড় ঝাঁপও করতে পারি না, তাই দিকে দিকে অনেক অনেক পা ছড়িয়ে দি। ছোট অবস্থায় আমাদের পাগুলো রোগা লিকলিকে হলে কী হবে, ওদের শক্তি কিন্তু প্রচুর আর সাহসও কিছু কম নয়। সেই কচি কচি মূলগুলো একা একাই অন্ধকারে মাটি-পাথরের ফাঁক দিয়ে এগলি সে গলি পার হয়ে দিব্বি এগিয়ে চলে। মাটির ভেতরে অন্ধকার হলেও যথেষ্ট হাওয়া আছে, ওদের নিঃশ্বাস নিতে কোন অসুবিধে হয় না। মোটেই ভেবোনা ওরা ছোট বলে একটুখানি পথ চলেই হাঁপিয়ে পড়ে। অনেক সময় ওরা সকলে মিলে মাইলের পর [illegible] যদি আমাদের সবকটা মূলকে পরপর সাজাতে পার অহলে দেখবে আমরা [illegible] শহর, গ্রাম পেরিয়ে বহু দূর পৌঁছে গেছি। তোমরা সব সময় দেখবে মাটির ওপরে আমাদের কাণ্ড যতটা লম্বা, মাটির নিচে আমাদের শিকড় তার প্রায় দ্বিগুণেরও বেশি গভীরে নেমে যায়।

এই অন্ধকার রাস্তায় চলতে চলতে প্রায়ই আমাদের ইঁদুর মেশো, কেঁচো পিসি বা বেজি মামার সগে দেখা হয় যায়। ওরা সব মাটির তলায় থাকে কিনা। ওখানে আরো যে কত ছোট ছোট বন্ধুদের দেখা পাওয়া যায় তা আর বলে শেষ করা যায় না। তাদের কারুর নাম 'ব্যাক্টেরিয়া', কেউ 'নেমাটোড', কেউ বা আবার 'ছত্রাক'। কী সব মজার নাম, তাই না? তোমাদেরও তো কত [illegible] এক বন্ধুর নাম 'ব্রাইজোবিয়াম' দিলে কেমন হয়? সবাই মিলে ওকে বেশ 'রিজো', রিজো' বলে ডাকবে। আমাদের বন্ধুরা কিন্তু খুব ভাল, কেউ আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করে না। ওরা বহু যুগ ধরে পৃথিবীতে আছে কিনা, তাই অনেক কিছু জানে আর আমাদেরও খুব সাহায্য করে। তবে মাঝে মাঝে দু একজন দুষ্টুমিও করে, কারণে অকারণে আমাদের পেছনে লেগে ক্ষতি করে। আমাদের কচি কচি চারা গাছগুলো তখন কেমন নেতিয়ে পড়ে। তোমরা তো মাটির ভেতরে ঢুকতে পারনা, তাই এদের অনেকেরই নাম, ঠিকানা আর গল্প তোমাদের কাছে এখনও অজানা।

৬

এই ফাঁকে আমার ভ্রূণ-মুকুলটা, মানে শরীরের ওপর দি[illegible] মেরে, ফাটিয়ে, পুট্ করে মাটির ওপরে উঠে এসেছে। সেই আমি প্রথম সূর্যের আলো দেখলাম। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে চোখটা প্রথমে কেমন ধাঁধিয়ে গেল। আরে ব্বাবা! পৃথিবীর ওপরটা কী সুন্দর জায়গা। ভোরের আলোয় চারপাশ একেবারে ঝল্‌মল্ করছে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে দেখলাম আমার কয়েকজন ভাই বোন আমার আগেই উঠে পড়েছে, আর বাকিরা তখনও মাটির তলায় ঘুমিয়ে কাদা।

দূরে কোথায় যেন কারখানার ভোঁ বাজল। এ বাড়ির সমস্ত দরজা জানলা এখনও বন্ধ। অনেক দিনের গরমের পর আজ ভোর রাতে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হওয়াতে সকলে বোধ হয় আরামে ঘুমোচ্ছে।

এদিক ওদিক চেয়ে আমার আশে পাশের প্রতিবেশিদের চিনে নিচ্ছিলাম। দেখলাম ছোট গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে এ চত্বরের সবচেয়ে লম্বা গাছ, রক্ত পলাশ। যদিও ওর ভাল নাম ক্ল্যাথোডিয়া, বাচ্চারা ওর নাম দিয়েছে পিচকিরি গাছ। কারণ ওর কুঁড়িটা টিপলে পিচকিরির মত জল ছেটায়। রাতের অন্ধকারে কোন কুঁড়ির ওপরে পায়ের চাপ-পড়লে জলের ছেটায় চমকে উঠতে হয়। আজ ভোরের আলোর ওকে রীতিমতো 'মিস্ ইউনিভার্স' দেখাচ্ছে। যেমন লম্বা গড়ন, তেমন ঝাকড়া পাতার মাথায় বড় বড় লাল ফুলের বাহার। পায়ের তলায় খসে পড়া রাঙা ফুলের কার্পেট বিছানো। আর কিছু কিছু আমার আশে পাশেও খসে পড়েছে। আমার পেছনে রয়েছে একটা অ্যালামান্ডা লতা, তাতে বেশ বড় বড় হলুদ রঙের ফুল ধরেছে। ঐ দিকটায় আমার নজর পড়তেই লতার মধ্যে কে যেন একটা খড় বড় করে নড়ে উঠল। একটু মন দিয়ে তাকিয়ে দেখি পাতার ফাঁক দিয়ে দুটো ড্যাবা ড্যাবা ড্যাবা চোখে আমায় দেখছে, আর পাতার নিচ থেকে একটা ইয়া লম্বা সরু লেজ ঝুলছে। মনে মনে ভাবছি এটা আবার কে রে বাবা! সে তখন একটু নড়ে চড়ে পাতার আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে খশখসে গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কিরে, তোরা আবার কবে এলি? ভাল আছিস তো? আমি বললাম, 'এইতো আজই, বেরুলাম ভালই আছি। কিন্তু তুমি কে?' সে বলল, 'আমি তো গিরগিটি, আমার ভাল নাম ক্যালোটিস্ (Calotis), আমায় কেলোদা বলেও ডাকতে পার'। কেলোদার গলাটাও যেমন খশখশে ওকে দেখতেও তেমনি বিটকেল। কিন্তু আস্তে আস্তে বুঝলাম ওর মনটা ভারি নরম। কেলোদার কাছে এবাড়ির পেছনের বাগানের অনেক কিছু খবর পেলাম। ওদিকে নাকি জবা, সুপুরি, লেবু, সন্ধ্যামণি এরা সব থাকে। আর আছে গুড়িং বলে একটা চট্‌পটে বেড়াল ছানা। তোমরা কি গুড়িংকে চেন? ওর পুরো নাম 'গুড়িং ম্যাঙাওনি', অন্ততঃ ওর মা, ঐ নামেই ওকে ডাকে। পরে অবশ্য গুড়িংও আমাদের খুব বন্ধু হয়ে গেছিল। আমাদের কেলোদা সামনের বাগানেই থাকতে বেশি ভালবাসে। কারণ এদিকের মালতি, মাধবী, জুঁই, অ্যালাম্যাণ্ডার সঙ্গে ওর ভাব বেশি। তাছাড়া ওর রক্তটা বড্ড ঠাণ্ডা বলে একটু রোদ পেলে ওর বেশ আরাম হয়? বাড়ির পেছনের দিকটায় খুব একটা রোদ পৌঁছয় না।

JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register

জমিয়ে রাতে এক পশলা বৃষ্টি হওয়াতে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেল। দাদু কাপে চা নিয়ে বাগানে বেরিয়ে এলো। মাটির ওপরে আমাদের খুদে খুদে মুণ্ডু উঁকি দিচ্ছে দেখতে পেয়েই তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে গেল। আবার একটু বাদেই দিদুকে নিয়ে উৎসাহ ভরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাদের দেখিয়ে বলতে থাকল, 'দেখ, ট্যাঁড়শ বাবাজিরা কেমন মুখ বার করেছে।' এবারে দুজনে একসঙ্গে বলে উঠল, 'ওদের কী খুশি দেখাচ্ছে, বল?'

দাদু, দিদুর যত্নে আর প্রকৃতিমার নিয়মে আমরা আস্তে আস্তে বড় হতে থাকলাম। দু চারদিনের মধ্যেই আমাদের বাকি সঙ্গীরাও মাটি ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল। আর এই ক'দিনে আমার ভ্রূণমুকুলটাও বেশ শক্তপোক্ত কাণ্ড হয়ে গেছে। ব্যাস, তার পর আর কি? যেমন একটু একটু করে আমাদের মূলটাও বাড়ল, তেমনি মাটির ওপরে আমাদের কাণ্ডটাও। প্রথমে দু পাতা তারপরে তিন পাতা। তোমরা যেমন প্রথমে হামা দাও তারপরে টলমল করে হাঁটতে শেখো, তেমনি আর কি।

৭

সোম আর পরাগ-জানত, দাদুরা এই বাগানে ট্যাঁড়শের বীজ লাগিয়েছে। ওরা মাঝে মাঝে আমাদের খোঁজ করতে আসত আর আমাদের নতুন নতুন পাতা দেখে ভারি মজা পেত। একদিন ওরাও বাগান বাগান খেলবে বলে দিদুর কাছে বায়না করল। দিদুও খুব খুশি হয়ে গেটের কাছে একটা জায়গা ওদের বরাদ্দ করে দিল। ওরা তখনই দুটো খুরপি নিয়ে 'হাঁইয়ো হাঁইয়ো' করে যতটা পারল গভীর করে একটা গর্ত করে ফেলল। তারপর দিদুর কাছ থেকে কিছু বীজ নিয়ে ঐ গর্তে ফেলে, মাটি চাপা দিয়ে তার ওপরে বেশ করে লাফিয়ে মাটিটা চেপে দিল। শেষ কালে এক মগ জল ঢেলে ওরা সেদিনের মত বাড়ি চলে গেল।

এরপরে রোজ স্কুল থেকে ফিরেই ওরা দেখতে আসত, ওদের বীজের পাতা দেখা যাচ্ছে কিনা আর আরো এক মগ জল ঢেলে চলে যেত। এই ভাবে একদিন যায়, দুদিন যায় কিন্তু নাঃ সাতদিন পরেও চারাগাছের দেখা নেই। আমরা পাশ থেকে ওদের কাণ্ড দেখে হেসে বাঁচিনা। দাদুও চুপটি করে ওদের মজা দেখে। শেষ কালে একদিন আর থাকতে না পেরে দাদু ওদের ডেকে বলল, 'হ্যাঁরে, একবার খুঁড়ে দেখ দেখি বীজগুলোর কী দশা হয়েছে, ওদের ঘুম ভাঙছে না কেন।' তখন জায়গাটা খুঁড়ে দেখা গেল মাটিটা জলে একেবারে গপগপ করছে আর একগাদা বীজ ছোট বড় অঙ্কুর নিয়ে পচে বসে আছে। বীজ গুলোর অবস্থা দেখে সোম আর পরাগের চোখে জল ছল্‌ছল্ করছে। দিদু তখন ওদের আদর করে কোলের কাছে বসিয়ে বুঝিয়ে দিল ওরা কি মারাত্মক ভুলটাই না করেছে। প্রথম কথা, অত গভীর গর্তে বীজ বসানোর জন্য সেখানে একটুও আলো পৌঁছয় নি। তার পরে গর্তটার ওপরে ওরা এত দাপিয়েছিল যে হাওয়া ঢোকার ফাঁক সব বন্ধ হয়ে গেছিল। আর শেষ কালে [illegible] জল [illegible] বীজদের [illegible] গেছিল। বীজেদের প্রথম ঘুম ভাঙবার সময় জল, বাতাস আর আলো [illegible] তো দাদু মাটির একটু তলায় আমাদের পুঁতেছিল আর দিদু কেবল হালকা করে জল ছিটিয়ে দিয়েছিল। তাই না আমরা সবই ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছি। এইসব শুনে ওরা বলল, 'আর বাগান করব না, চল পাড়ায় গিয়ে লুকোচুরি খেলি।'

৮

একটা ব্যাপারে তোমাদের সঙ্গে আমাদের খুব তফাত, তোমরা একটু পড়ে গেলেই বড়রা 'ধর্ ধর্' ক'রে ছুটে আসে। তোমাদের একটু খিদে পেলেই সবাই খাওয়ার ব্যাবস্থা [illegible] দেয়। আমাদের [illegible] তেমন কোন লোক নেই। আমাদের ছোটবেলাটা তোমাদের মত আহ্লাদে কাটে না। তোমরা বেশ অনেক বছর ধরে বড়দের আদরে আদরে কাটিয়ে দাও। তোমাদের কথা বলতে দেরি, হামা দিতে দেরি, হাঁটতে দেরি। তারপরে ইস্কুলে গিয়ে লেখা পড়া শেখা, বড় হওয়া। বাপরে! আমরা কিন্তু প্রথম থেকেই সবকিছু নিজেরা করি, এমন কি নিজের খাবার টুকুও নিজেকেই বানাতে হয়। আমরা তোমাদের মত ছোট থাকতে ইস্কুলে গিয়ে এসব শিখতে হয় না। আমরা প্রকৃতির ভেতরেই থাকি কিনা, তাই প্রকৃতি-মা আমাদের শিখিয়ে দিয়েছে, কী করে মাটির ভেতর থেকে জল আর জলে গুলে থাকা খনিজ লবণ টেনে নিতে হয়। তোমাদের বাড়ের বয়সে মা-রা যেমন সব [illegible] বলতে থাকেন, সব [illegible] হবে, ভিটামিন চাই, আরো অন্যান্য খাদ্যগুণের দিকেও লক্ষ রাখতে হবে'—এই আর কি।

তবে আমাদের আসল পেট ভরানো খাবার তৈরি করে দেয় সবুজ পাতার দল। তারা প্রত্যেকেই এক একটা বিশাল রান্নাঘর। সূর্যের আলো ওদের গায়ে পড়া মাত্র ওরা ঝপাঝপ্ খাবার বানাতে সুরু করে আর সেই খাবার পেয়ে আমরা তরতর করে বেড়ে উঠি।

তোমরা, নাঃ শুধু তোমরাই বা বলি কেন, মানুষ, কুকুর, বেড়াল, বাঘ, ভাল্লুক, ময়না, টিয়া, সব্বাই যে নিঃশ্বাস নাও সেই নিঃশ্বাসের চাবি কাঠিটা কিন্তু আমাদেরই

হাতে। আমাদের জন্ম লগ্ন থেকে প্রতিদিন তোমাদের জন্য অক্সিজেন তৈরি না করে ঘুমোতে যেতে পারি না। আমাদের জীবনে শনি-রবিবার নেই, গ্রীষ্মের ছুটি নেই, পূজোর ছুটি নেই। প্রকৃতি মার কাছে আমাদের একথা বলার উপায় নেই যে, 'আজ আমাকে ছুটি দাও টিভি দেখবে [illegible] আমাদের রিটায়ার করার উপায় নেই। বুড়ো হয়ে গেলেও শেষ মুহূর্ত অবধি চলে তোমাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা। আমরা অক্সিজেন না বানালে তোমাদের কবে দম বন্ধ হয়ে যেত। তাছাড়া তো ছায়া দেওয়া, ফুল ফোটানো, ফল বানানো, এসব কাজ থাকেই। আমরা ফল বানালে তবেই তো তোমরা খাবে। এই যে শুনি পৃথিবীতে নাকি মানুষ দিনকে দিন সংখ্যায় বেড়ে চলেছে তো চলেইছে। তাদের সকলের টিকে থাকার জন্য আমরা, মানে আমাদের মত গাছেরাই তো খাবার তৈরি করে দেয়। এই ধর, তোমাদের পাড়ার গোয়ালা দাদার গরুটা বা ছাগলটা—যার দুধ তোমরা খাও, তারাও তো সবাই আমাদের তৈরি করা খাবার খেয়েই বেঁচে থাকে। একবার ভাবতো, আমরা সবাই যদি [illegible] বলে বন্ধ ডাকি মানে কাজ করব না [illegible] বসে থাকি তাহলে কী অবস্থাটাই না হবে!

এই বাগানে থাকতে থাকতে ক্রমে আমার অনেক বন্ধু বান্ধব জুটে গেল। আমি বড্ড লোকজন ভালবাসি কিনা, মাছি দাদা, মশা দিদি, ইঁদুর মেশো, কেঁচো পিসি, ব্যাঙ মাসি কারুর সঙ্গেই গল্প করতে ছাড়ি না। তবে অবশ্য কেলোদাই আমার সব থেকে ভাল বন্ধু। তুমি যদি এদের সঙ্গে ভাব জমাতে পার, তাহলে দেখবে কোনদিনই তোমার একলা একলা মন খারাপ হবে না। এর মধ্যে কোন দিন যদি এমন হয় যে তোমার মা কোন কাজে বাইরে গেছেন, বাবা অফিসে আর ঠামি অবেলায় ঘুমিয়ে কাদা, সেদিন তুমি আমাদের কাছে চলে এস। আমরা তোমায় অনেক গল্প শোনাব। তবে আমরা তো তোমার মত [illegible] প্রথম তোমার একটু অসুবিধে হতে পারে। আমাদের সঙ্গে ভাব জমাতে হলে তোমাকে একটু ধৈর্য্য ধরতে হবে। চুপটি করে বসে বসে আমাদের নড়াচড়া দেখে তোমায় সব বুঝে নিতে হবে। কদিন পরেই দেখবে তুমি অনেক কিছু বুঝে যাচ্ছ।

১০

দেখতে দেখতে দোল এসে গেল। বাগান বিলাস লতাটা দোতলার ছাদ অবধি ফুলে ফুলে আবির রঙে রেঙেছে, একটাও পাতা দেখা যাচ্ছে না। সকাল থেকে পাড়ার কুচোকাচারা রং নিয়ে মহা ব্যাস্ত, দাদু দিদুও বাচ্চাদের দলে ভিড়বার জন্য উশখুশ করছে। এমন সময়ে পরাগ তার দল বল নিয়ে ধাঁ করে ছুটে এসে জানতে চাইল, 'দাদু কোথায়? দাদুর ভুঁড়িতে রং দেব'। বলতে না লতে তিন দিক থেকে পিচকিরির গোলাপী, বেগুনী রং ধেয়ে এলো। দাদু তো ভিজে চুপসে একাকার, দিদুর গায়েও একটু ছিটে ফোঁটা লেগে গেল। দিদু তাড়াতাড়ি ঘর থেকে রসগোল্লার হাঁড়ি নিয়ে ওদের ডাকতে থাকল, 'ওরে দাঁড়া, দাঁড়া, মিষ্টি খেয়ে যা।' কিন্তু কে কার কথা শোনে, ততক্ষণে বিচ্ছুদের দল হাওয়া। ওদের তখন খাওয়ার সময়ও নেই। অবস্থাও নেই। বরং রাস্তায় অন্য কোন দাদুকে পেলে কাজে দেয়। আমরাও রং খুব ভালবাসি। প্রকৃতি মা আমাদের নানান রং নিয়ে সাজবার উপায় করে দিয়েছে। ক—ত রঙেরই না ফুল পাতা দিয়ে আমরা সাজতে পারি। তবে আপশোস এই যে, সব ট্যাঁড়শের ফুলই স্কুলের ইউনিফর্মের মত কেবল হলুদ রঙেরই হয়। অথচ দেখো আমাদের জেঠতুতো বোন, জবাদের কী মজা। ওদের ফুলে লাল, সাদা, গোলাপী, হলুদ কত না রঙের বাহার! দেখলে হিংসে হয়।

আস্তে আস্তে সূর্য অস্ত গেল আর অমনি পুব আকাশে একটা মস্ত বড় সোনার থালার মত দোল পূর্ণিমার চাঁদ টুপ্ করে উঠে এলো। মশা দিদি খবর দিয়ে গেল, দাদুদের বাড়ি খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। দোতলার হল ঘরের জানলায় জানলায় বাসন্তী রঙের পর্দা টাঙ্গানো হয়েছে, লাল মেঝেতে সাদা আর হলুদ দিয়ে একটা প্রকাণ্ড আল্পনা দেওয়া হয়েছে। আর প্রচু—র ফুল এসেছে। ক্রমেই উৎসবের গান বেশ জমে উঠল। ওরা সবাই মিলে যখন জোরে জোরে 'দখিন-হাওয়া জাগো জাগো',....গাইছিল তখন আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল। আমরাও তখন সব সাথিদের সঙ্গে ছুটে চাঁদের আলোয়, হাওয়ার দোলায়, তালে তালে নাচছিলাম। সেদিন অনেক রাত অবধি চাঁদা মামার কাছে আকাশের অনেক গল্প শুনলাম। মামা বলছিল অনেক অনেক দূর আকাশে বৃহস্পতি বলে একটা গ্রহ আছে যার নাকি বারোটা চাঁদ। ভাবোতো কী অপরূপ শোভা, এক আকাশে এক সঙ্গে তিন চারটে চাঁদ দেখা যায়। সেই গ্রহটা না জানি কত সুন্দর! কিন্তু সুন্দর হলে কী হবে, সূর্যের এতগুলো গ্রহের মধ্যে একমাত্র পৃথিবীতেই গাছপালা, জীবজন্তু বাঁচতে পারে। সুতরাং বেশি লোভ করে লাভ নেই। আমাদের এ জীবনে ওখানে গিয়ে ঐ দৃশ্য উপভোগ করা ভাগ্যে জুটবে না। সে নাই জুটুক, আমাদের এখনেও কম মজা নেই, খালি একটু দেখতে জানা চাই।

চাঁদা মামার কাছে এই সব গল্প শুনতে শুনতে ভোর

JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register

রাতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, টের পাইনি। আবার সকাল থেকেই তো আমদের কাজের পাঁজা থাকে। তুমি ক'টায় ঘুম থেকে ওঠো জানিনা, তবে আমরা কিন্তু দিনের আলো ফুটতে না ফুটতে কাজে লেগে যাই।

আমাদের আশে পাশে রাত-জাগা বন্ধু আরো অনেক আছে। তোমাদের যদি কখনও রাত্রে ঘুম ভেঙে ভয় করে, জানবে ভয়ের কিছু নেই। তোমাদের আগলে অনেকেই জেগে আছে, আর নিজের কাজ করে যাচ্ছে। তাদের ক'জনকে তোমরা চেনো দেখতো—শিউলি ফুল, জুঁই ফুল, রকমারি মথ, ঝিঁঝিঁ, বেজী, আরশোলা, প্যাঁচা, আরো কত কেউ। সোম কিন্তু অন্ধকারকে বড্ড ভয় পায়। সন্ধের পর দাদু যদি ওকে বলে, 'যা তো দোতলা থেকে কাঁচিটা নিয়ে আয় তো', তবে ওর হয়ে গেল। দুটো সিঁড়ি ওঠে তো আবার একটা নেবে আসে। তাই দাদু ওকে একদিন বারান্দায় বসে বলছিল, 'এই শোন, তোর মাকে বলবি তো, তোকে যেন একটু 'সাহস' কিনে দেয়। চার আনা, আট আনায় একটু করে কিনতে পাওয়া যায়। তুই একটাকারও কিনতে পারিস, তাহলে একটু বেশি করে দেবে'। কোথায় পাওয়া যাবে জানতে চাইলে দাদু বললে, 'ঐ তো গড়িয়াহাট বাজারে, মাছের দোকানের ওপরে। দোতলায় উঠে যাবি, দেখবি ডান দিকের শেষের দোকানটায় 'সাহস' বিক্রী হচ্ছে, সোম বাড়ি গিয়ে ঠামির কাছে এই বায়না করলে বাড়ির সকলে এত জোরে হেসে উঠেছিল যে আমরা এই বাগান থেকে শুনতে পেলাম। সেই লজ্জায় সোম 'ভ্যাঁ' করে কেঁদে ফেলল।

১১

আমি মাঝে মাঝে ভাবি অনেক দিক থেকে তোমরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বেচারা। তোমরা খালি-চোখে সূর্যের আলোর মধ্যে কোন রং দেখতে পাও না। কিন্তু আমাদের চোখ না থাকলে কি হবে, প্রকৃতি মা আমাদের দেহের ভেতর এমন সব ব্যাবস্থা করে রেখেছেন, যাতে আমরা সূর্যের আলোর ভেতর থেকে আলাদা আলাদা করে রামধনুর সাতটা রং ধরে রকমারি কাজে লাগাই। তাছাড়াও সূর্যের দূরলোহিত রশ্মি আমরা মাটির তলাতেও ধরতে পারি। তুমি একবারটি যদি গাছের ভেতরে ঢুকতে পারতে, আমি তোমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কত রকমের যে মজা দেখাতে পারতাম, কী বলব!

১২

দোলের পর বেশ-কটা দিন কেটে গেছে। আমরা এখন লম্বায় প্রায় পরাগের সমান হয়ে গেছি। আমাদের কাণ্ডে এতদিনে ন'দশটার বেশি পাতা গাজিয়ে গেছে। এই সময়ে আমাদের ওপরের পাতার ছায়ায় নিচের পাতাদের রোদ পেতে বেশ অসুবিধে হয়। আর ঠিক মত রোদ না পেলে খাবার দাবার তৈরি করব কী করে, বলতো। সেই অবস্থাটা সামলানর জন্য আমাদের একটা মজার কায়দা আছে। আমাদের নিচের দিকের পাতার ধারগুলো প্রায় গোটা আর ক্রমশ যত ওপরের দিকে পাতা গজায় সেগুলো খাঁজ কাটা। হতে হতে তাদের খাঁজ প্রায় [illegible] ফলে খাঁজের ফাঁক দিয়ে নিচের পাতায় প্রচুর রোদ পৌঁছে যায়। তোমরা [illegible] বন্ধুদের বেশ ঠকাতে পার। ওদেরকে কোন গাছের পাতা জিজ্ঞেস করলে, ওরা আলাদা গাছ মনে করে আন্দাজে আন্দাজে অনেক উল্টো-পাল্টা নাম বলতে থাকবে।

প্রজাপতি-মথরা কিন্তু গাছের পাতা খুব ভাল চেনে। তাদের বাচ্চারা, মানে শুককীটরা যে যে পাতা খেতে ভালবাসে ঠিক সেই সেই খানেই ওদের মারা ডিম পেড়ে দিয়ে যায়। যাতে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুলে ওরা সঙ্গে সঙ্গে পছন্দমত খাবার পেয়ে যায়। ওরা যখন আমাদের পাতা খেয়ে খেয়ে ফুটো ফুটো করে দেয় তখন সেটা টুনটুনি পাখির নজর এড়ায় না। [illegible] ওদের উপস্থিতি টের পেয়ে পটাশ পটাশ করে খাবার জন্য চলে আসে। প্রকৃতিতে [illegible] পোকায় খেল, আবার পোকারা টুনটুনির পেটে গেল। তবে প্রকৃতিতে কোন কিছুই বাড়াবাড়ি হবার যো নেই—সবাই সবাইকে সমঝে চলে। তাইতো আমাদের পাতায় পোকা লাগলে দাদুরা মোটেই তড়িঘড়ি কীটনাশক দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয় না।

চড়াই পাখিদের পছন্দটা আবার একটু অন্য রকম। তারা মে-জুন মাসে স্প্যাথোডিয়া গাছে খুব ঘুরঘুর করে। কাজল লতার মত ফলের শক্ত খোলসটা ফাটলেই চড়াইরা বৌ-বাচ্চা নিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে হাজির হয়। চড়াইরা একটা করে বীজ ঠুকরে খায়, তো আর পঁচিশটা হরির লুঠ দেওয়া [illegible] যদি তুমি এখানে আস তোমার মনে হবে ভরগ্রীষ্মে যেন হালকা তুষার পাত হচ্ছে। বীজগুলো [illegible] আনাচে কানাচে ঘাস-পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। ওখানে বসে বসে ওরা কিন্তু আবহাওয়া দপ্তরের খোঁজ রাখতে ভোলে না। ঠিক চৈত্র মাস এলে মাটির ওপরে দল দলে ওদের কচি মুখগুলো তুলে ধরে। ওদের বীজগুলো খুব হালকা বলে অনেক দূর দূর ভেসে যেতে পারে। গরমকালে রেণুদি ঘর ঝাঁট দিতে গিয়ে মুঠো মুঠো বীজ বাইরে ফেলে আর গজগজ করে, 'তোদের কী পড়ার একটুও বিরাম নেই।' এদিকে দিদু ভাবে

পাশের খালি জমিটায় বীজ পড়ে পড়ে যদি স্প্যাথোডিয়ার জঙ্গল হয় তো মন্দ হয় না। এই একটা গাছেই কত পাখি এসে কিচিরমিচির সেখানে দশ-বারোটা গাছ হলে আর রেডিও খুলতে হবে না।

তোমাদের অনেকেরই যেমন ছোট বেলায় হাম বা [illegible] সমস্যা আছে। কদিন আগে যখন আমি আর একটু ছোট ছিলাম তখন আমার থেকে একটু দূরে আমার এক ভাইএর তলার দিকের পাতায় কেমন সব ছাপকা ছাপকা দাগ দেখা দিয়েছিল। তরতাজা, সবুজ পাতাগুলোর সব শিরা আস্তে আস্তে হলুদ হয়ে গেল। তখন গোটা পাতায় সবুজের ওপর হলুদের জালজাল দাগ ধরে গেল। তাই দেখে কেঁচো পিসি জানিয়ে গেল ওকে একধরনের 'ভাইরাস' ধরেছে। তাই না শুনে আমার ভাই তো ভয়েই অস্থির। যদিও ওর কান্ডর ওপরে অনেক পাতা থাকাতে ওর তেমন কোন ক্ষতি হয় নি, ও সে যাত্রা সামলে নিল। দাদু ও [illegible] গেল, ওকে হলুদে শিরার 'ভাইরাস ধরেছে, বেশি করে খাবার দিলেও কিছু হবে না [illegible] পারবে না।' এটা হ'ল তোমাদের সর্দির মত—ওষুধ খেলে সাত দিনে সারবে, না খেলে এক সপ্তাহ লাগবে। আমার ভাই এরও সেই অবস্থাটাই হল, যদিও তার পরেও ও অনেক দিন টিকল কিন্তু আগে যেমন করে বাড়ছিল, সেটা কমে গেল।

১৪

এরমধ্যে একদিন পরাগ এসে দিদুর কাছে একটু মাটি চাইল। দিদু কারণ জানতে চাইলে বলল যে ওদের স্কুলের দিদিমণি ফুলের গাছ নিয়ে যেতে বলেছেন। দিদু হেসে বলল, 'কী যে বলিস পাগলের মত, একদিনেই ফুলশুদ্ধ গাছ হয় নাকি? মরসুমী ফুলের গাছও তোকে তুলে দিলে লাভ [illegible]। ওরা এখন সব বড়ো হয়েগেছে, আর চারা নেই। এই বয়সে তুলে লাগালে বাঁচানো যাবে না। আর [illegible] তাতে ফুল ধরতে দেরি আছে।' এতক্ষণ একা পরাগে রক্ষা ছিল না, এবারে সোমও এসে জুটল। ওর গলাতেও সেই একই নাকি কান্না, ওর স্কুলের স্যার ও নাকি ঐ রকম চারাগাছ নিয়ে যেতে বলেছেন। দিদু ওদের সারা বাগান ঘুরিয়ে দেখাল যে, যখন তখন সব গাছে ফুল হয় না। তাছাড়া যাদের সারা বছর ফুল হয় তাদেরও ছোট থেকে একটু বাড়তে দিতে হয় তবেই ফুল ধরে। দিদু ওদের বলল, 'তার চেয়ে বরং তোরা ভাঁড়ে ছোলার বীজ লাগা, চারাগাছ বেরুলে স্কুলে নিয়ে যাস তখনই।' আর কোন উপায় না দেখে ওরা তাতেই রাজি হল। ওরা এবারে অবশ্য আগের বারের ভুলগুলো আর করেনি। তাই দিন দশেকের মধ্যেই দুজনের নিজের হাতে করা ভারি মিষ্টি দুটো চারাগাছ নিয়ে স্কুলে নিয়ে যেতে পারল। সেগুলোতে বেশ কাণ্ড, পাতা, পর্ব, পর্বমধ্য সব দেখা যাচ্ছে। আর নিজে হাতে করেছে বলে ওরা সবাইকে বেশ গুছিয়ে বলতে পারল, গাছ করতে গেলে কি কি করতে হয় আর কি কি করতে নেই। তাতে ওদের গাছে ফুল না থাকলেও, স্কুলে ওদের খু—ব সুনাম হ'ল।

১৫

বৈশাখ মাস ভোর খুব চড়চড়ে রোদ থাকায় কদিন আমাদের খুব খাটাখাটনি যাচ্ছিল। সারাদিন ধরে আরো বেশি করে জল টানা, খাবার বানানো এই সব করতে করতে বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। সন্ধে থেকেই বেশ ঢুলুনি আসত।

১৬

আমি এই ক'দিনে বেশ ডাগরটা হয়ে উঠেছি। আমি এখন দলের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা। রোজ সকালে আমার মাথার দিকে একটা করে হালকা হলুদ রঙের ফুল ফোটে। ফুলের মধ্যিখানটা গাঢ় মেরুন রঙের আর তার মাঝখান থেকে একগুচ্ছ হলুদ পুংকেশর, দণ্ডের মত খাড়া হয়ে থাকে। আবার তার মাথায় যাকে মেরুণ ভেলভেটের মত গর্ভমুণ্ড। সবার নিচে রয়েছে হালকা সবুজ বৃতির বাটি আর তার তলায় সরু সরু উপবৃতি দিয়ে বালিশ দেওয়া। অনেকটা জবা ফুলের মত। আমরা ওদেরই খুড়তুতো বোন কিনা তাই দেখলেই চেনা যায় একই বাড়ির মেয়ে। ভেবো না আমি গর্ব করছি, তোমায় বলে বলছি, এত সুন্দর ফুল প্রকৃতি-মা খুব কম গাছকেই দিয়েছে। আমাদের এই ফুল ফোটার ব্যাপারটাও ভারি মজার। আমাদের বীজেদের যেমন গ্রীষ্মকালে ঘুম ভাঙে আমাদের ফুলও তেমনি গরমেই ফোটে। আমরা মোটেই ঠাণ্ডা ভালবাসিনা। তোমরা যেন বাড়িতে মা বাবার কথা আর স্কুলে আন্টিদের কথা শুনে চলো, তেমনি আমাদের হেড মাস্টার হ'ল সূয্যি মামা। যখন সূয্যিমামা বলে, 'এবারে একটা ফুল ফোটাও দেখি', অমনি সারা দিন রাত তার তোড়জোড় চলে। আর অবশেষে সকাল বেলায় একটা করে ফুল পুটুস করে পাপড়ি মেলে মামার পানে চেয়ে হাসে। আমাদের গাছে ফুল ফুটেছে শুনে সোম একদিন দেখতে এলো। ও নাকি অফিসের দিনে ওর দাদুর কাছে প্রায়ই বায়না ধরে, 'আমাকে সেই অনেক অনেক ফুল ওয়ালা দাদুর বাড়ি নিয়ে যাচ্ছ না কেন?' এর মধ্যে একটা রবিবার পেয়ে আর ছাড়াছাড়ি নেই, নিজের দাদুর

JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register

হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলো। ওর দাদু ওকে গ্রিলের গেটের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। সোম ঘরে ঢুকে প্রথমেই ফাঁকা চকচকে মেঝেতে মনের আনন্দে ঘরের এমুড়ো থেকে ওমুড়ো পর্যন্ত গড়াগড়ি খেতে থাকল। একটু বাদে সেটা যখন একঘেয়ে হয়ে গেল তখন সামনের জানলায় এসে তার স্বরে পরাগকে ডাকতে আরম্ভ করল, 'এই পরাগ, আয়নারে দাদুর বাড়ি। খেলা করব।' খানিক পরে পাঁচিলের ওপারে পরাগের মাথার ডগাটা দেখা গেল। গেট খুলে ও পিড়িং পিড়িং ক'রে লাফাতে লাফাতে একেবারে সোমের কাছে হাজির হয়ে গেল। তারপরে দুজনে লতায় ছাওয়া জানলার চওড়া ধাপে বসে 'ট্রেন, ট্রেন' খেলতে লাগল।

সেই 'ট্রেন, ট্রেন' খেলা থামিয়ে পরাগ হঠাৎ ব্যস্ত সমস্ত হয়ে দিদুকে ডাকতে আরম্ভ করল, 'দিদুগো, তাড়াতাড়ি এদিকে এসো না। একটা জিনিস দেখবে এসো।' দিদু কাজের ফাঁকে চশমা মুছতে মুছতে এসে দেখে বাচ্চা দুটো আমাদেরই দিকে আঙুল দেখিয়ে কী একটা বোঝানোর চেষ্টা করছে। দিদু টপ্ ক'রে বুঝতে পেরে বলল, 'পাখিগুলোর কী বুদ্ধি দেখ' মাটি থেকে অত লম্বা ঘাসের ডগায় মুখ পাবে না বলে কেমন কায়দা করে ট্যাঁড়শ বাবাজির কাণ্ডে বসে মুখ নামিয়ে ঘাসের দানা খাচ্ছে।' সোম জানতে চাইল, 'ট্যাঁড়শ গাছে বসেছে কেন? ঘাস গাছে বসছে না কেন?' দিদু হেসে জবাব দিল, 'দুর বোকা। ঘাসের ডাঁটিটা কত সরু আর নরম দেখছিস না, পাখির ওজন ধরবে কী করে? উল্টে পড়ে যাবে না? তাই ট্যাঁড়শের শক্ত ডালে বসে মুখ নামিয়ে খাচ্ছে।' বাচ্চারা তো জানে না আমাদের এই শক্ত ডালের ভেতরে কত কায়দাই না করা আছে। তোমাদের বলে যেমন পাইপ দিয়ে জল আসে, আমাদেরও সরু সরু পাইপ দিয়ে মাটির জল কাণ্ড হয়ে পাতায় পৌঁছে যায়। আর খাড়া হয়ে দাঁড়াবার জন্য তোমাদের যেমন মেরুদণ্ড আছে আমাদেরও তেমন এই পাইপগুলোর গা দিয়ে সিমেন্ট বালির মত কয়েক পরত পলেস্তারা দেওয়া থাকে। তাই ছোট খাট পাখিরা বসলে আমরা ঘাসের মত নুয়ে পড়িনা। আবার হাওয়ার তালে তালে দুলতেও পারি ভেঙে পড়িনা, কি মজা বলতো? পরাগ এতক্ষণ ধরে পাখিগুলোর নাম বলার জন্য দিদুকে ব্যস্ত করছিল। দিদু বলল, 'দাঁড়া, আগে পাখি দুটোকে দেখ ভালকরে, তবে না আমি বই দেখে পাখির নাম বার করতে পারব।' দেখা গেল পাখিগুলোর সাইজ প্রায় চড়াই এর মত।ওদের পিঠের দিকটা মরচে রঙের, মাথাটা কালো আর পেটের দিকটা সাদার ওপরে কালো ছিটপিট্। বইএ বলছে এই

পাখিগুলো, 'তিলে মুনিয়া'। এই পাখিগুলোকে দেখে দিদুর আনন্দ আর ধরে না, কারণ এই বাড়িতে আসার প্রায় ন বছরের মধ্যে এই প্রথম ওদের দেখা গেল।

এর মধ্যে বাচ্চাদুটো ছাদে ওঠার জন্য দিদুকে বারে বারে পিড়াপিড়ি করছিল কিন্তু দিদুর হাত খালি নেই আর দাদু গেছে বাজারে! বড়রা সঙ্গে না থাকলে কোন বাচ্চাকে ছাদে [illegible] অবশেষে দিদুকে রাজি হতেই হ'ল। ছাদে উঠে আবার খানিকক্ষণ হুড়োহুড়ি চলল। [illegible] করল, পাশে যে ফ্ল্যাটবাড়িটা তৈরি হচ্ছে তার সমস্ত কাজকম্ম ওখানে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

আর যায় কোথায়, ঐ মজা ছেড়ে এরা আর কিছুতেই নিচে নামতে রাজি হ'লনা। দিদুকেও ওদের সঙ্গে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ল। দিদু থাকাতে ওদের কচি মনের অনেক প্রশ্নের উত্তর মিলল, ইঁটের ওপর সিমেন্ট দিলে কী হয়? ছাদ ঢালাই মানে কি? ছাদে অত জল জমা করছে কেন? ঐ জলে মাছ আছে কিনা, এই সব। ওদের গল্প বেশ জমে উঠল। ওদের কল্পনার ঐ জমা জলে একে একে পুঁটি মাছ, [illegible] সবই [illegible] করল। পরাগের এক মামার বাড়ি যেতে গঙ্গা পার হতে হয়। ওর পিন্টু মামা ছিপে ক'রে অনেক পুঁটি মাছ ধরে, মাঝে মাঝে পরাগকেও ছিপ ধরতে দেয়, পুকুর ঘাটে চান করার কি আনন্দ, এই সব অনেক মজার কথা বলছিল।

মিলে মিশে থাকার মজাটা আমাদের মত আর কে জানবে। আমাদের যখন ফুল ফোটে তখন দুনিয়ার মৌমাছি, পিঁপড়ে, প্রজাপতি, ফড়িং সবাই হৈ হৈ করে ছুটে আসে, তোমাদের ঐ কবিতাটার মত,"—ঐ ফুল ফুটে বনে, যাই মধু আহরণে—" ওরা যে শুধু আমাদের দেখতে ছুটে আসে তা নয়, আমাদের মধু বা রেণু নিতে গিয়ে আবির খেলার মত আমাদের রেণু নিয়ে এমন মাখামাখি করে দেয় যে [illegible] হয়। সক্কাল থেকে চলে ওদের আনাগোনা, অবশেষে মাঝ দুপুরে ওদেরও খেলা শেষ হয় আর আমাদেরও পাপড়ি মেলে রাখার পালা শেষ হয়। একটু একটু করে আমাদের পাপড়িগুলো বুজে আসে আর তারপরে শুরু হয় তোমাদের সকলের চোখের আড়ালে আমাদের আর এক রকম বেড়ে ওঠার খেলা। ঐ ফুলগুলির মধ্যে তৈরি হয় এক একটা ছোট্ট সবুজ ফল। আর কদিন পরেই ওটা হয়ে ওঠে একটা লম্বা ট্যাঁড়শ যার ভেতরে থাকে সার সার বীজ। এমনি করে আমাদের এক একটা গাছে পরপর ফল গজাতে থাকে আর পরাগের মত তোমরা

যারা ট্যাঁড়শ খেতে ভালবাস তাদের জন্য রোজ আমরা সবাই মিলে অনেক ফল ফলিয়ে দিই।

এই ফল তৈরি করার সময় আমাদের খাটনিটা একটু বেশিই পড়ে। ওদের মুখ চেয়ে অন্য সময়ের থেকে বেশি করে খাবার বানাতে হয়। বিশেষ করে ফলের সবচেয়ে কাছের পাতাগুলোর কাজ হ'ল ওদের তৈরি খাবার দিয়ে ফলটাকে মোটাসোটা ক'রে তোলা। কিছুটা খাবার আমরা [illegible] হয় যাতে গাছটাও লম্বা হয়ে পাতার কোলে কোলে আরো নতুন ফুল, ফল বানাতে পারে। আর বাকি খাবারটা পাঠাতে হয় শরীরের অন্যান্য অংশে। আমাদের এই খাবার পরিবেশন করাটা খুব কঠিন কাজ, একটাও মূল রোমকে খাওয়াতে ভুললে চলবে না। কিন্তু, তা সে যত দূরেই থাক আর যতই ছোট্ট হোক না কেন।

তুমি ইচ্ছে করলে আমাদের একটা ফলকে মাঝখান দিয়ে কেটে রঙে চুবিয়ে কাগজে ছাপ দিতে পার। আলাদা আলাদা রঙের ছাপ দিলে কী সুন্দর ডিজাইন হয়ে যাবে, দেখো খুব ভাল লাগবে। ভাবছ, এটা আবার কেমন পাগল রে বাবা! নিজের ফল নিজেই কাটতে বলছি! আসলে [illegible] তো সকলের মধ্যে বিলোনোর জন্যই তৈরি হয়। আমরা গাছেরা যদি ফল দেওয়ার ব্যাপারে হিংসুটেপনা [illegible] আর কারো খাবার জুটবে না। খিদের চোটে সক্কলে মরেই যাবে।

মে মাসের শেষের দিকে একটা শনিবারে পরাগ জানলা থেকে দিদুকে জানিয়ে রাখল ওর স্কুলে গরমের ছুটি পড়ে গেছে। আর তাই পরেরদিন সকাল থেকে ও বাগানে মাটি ঘাঁটতে আসবে। শুনে আমারও খুব আনন্দ হচ্ছিল, কিন্তু রবিবার আসাতে যত বেলা গড়াতে থাকল আমার শরীরটা যেন কেমন ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল। পাতাগুলো পর্যন্ত সোজা করে মেলতে পারছিলামনা, মনে হচ্ছিল এরপরে হয়তো কোন বড় রকমের অসুখ করবে। সোম, পরাগ কারুরই পাতা নেই। ওদের দেখে যে মনটা একটু ভালহবে তারও উপায় নেই। এমনটা তো আমার খুব একটা হয় না। বড়জোর দুপুর রোদে একটু [illegible] এবং [illegible] সেরে যায়। আজকেরটা যেন একটু বেশি বেশি। আসলে ব্যাপারটা হয়েছিল কি, সবটাই কেষ্টদার দোষ, ও অবশ্য না বুঝেই কাণ্ডটা করেছিল। স্থলপদ্ম গাছের গোড়ায় আমাদের ইঁদুর মেশোর বাড়িতে ঢোকার পথ। ওদের কাচ্চাবাচ্চারা সংখ্যা যত বাড়ছে, বাড়িতে তত যায়গার দরকার হচ্ছে। তখন ইঁদুর মেশো এদিকে ওদিকে বাড়িটাকে বাড়াচ্ছে। জানতো ওরা মাটির তলাতে সুড়ঙ্গকরে বাড়ি বানায়।

ইঁদুর মেশো এমনিতে খুব বুঝে সুঝে কাজ করে। ও খুব সাবধানে গাছের শেকড় বাঁচিয়ে ওরপাতাল বাড়ি তৈরি করে। কারণ আমরা শিকড়ের জাল দিয়ে মাটিটাকে ধরতে না পারলে ওর বাড়ি ধসে পড়বে তো। কেষ্টদা কদিন ধরেই লক্ষ করছিল, স্থলপদ্মের গোড়ায় মাটির ঢিপি কেবলই আরো উঁচু হয়ে উঠছে। ও ভাবল বাগানের মাটির নিচে ইঁদুর না জানি কি সর্বনাশই না করছে। এতএব দে গর্তের মুখ বুজিয়ে, ইঁদুর বেটা দম বন্ধ হয়ে মরুক। কিন্তু তা তো হওয়ার নয়। ইঁদুর মেশো অত বোকা নয়। তবে ব্যাপারটা খুব আচমকা হওয়াতে ও প্রথম চট্‌কায় এটু ঘাবড়ে গেছিল। তাড়া হুড়ো করে বেরুনর জন্য একটা নতুন পথ কাটতে গিয়ে আমার একটা মোট্টা শিকড় কেটে দৌড় দিয়েছিল। এদিকে আমার প্রাণ যায় আর কি। ভাগ্যে কেঁচো পিসি সেই সময় ঐ পথদিয়ে যাচ্ছিল, আমার কষ্ট দেখে তাড়াতাড়ি করে ঐ কাটা জায়গায় ওর মুখের ঠাণ্ডা লালা বুলিয়ে দিতে একটা আরাম পেলাম। সে যাত্রা বেঁচে গেলাম বটে। কিন্তু আমার সরু শিকড় দিয়ে খাবার জোগাড় করতে বড্ড ঝামেলা হচ্ছিল। আমি দিনের পর দিন নেতিয়ে আছি দেখে দাদু রোজ একবার করে বলত, 'এই গাছটাকে মোটেই খুশি দেখাচ্ছে না। ওর একটা কিছু অসুবিধে হয়েছে নিশ্চয়।' কিন্তু আমার এই ব্যামো সারানো ওদের সাধ্যের মধ্যে নয়। তবে দাদু নিয়ম করে আমাকে জল আর অল্প করে সার দিয়ে যাওয়াতে আমার সেই সময়টা সামলাতে খুব সুবিধে হয়েছিল। প্রকৃতি মার আশীর্বাদে আমি চট্‌জলদি কয়েকটা নতুন শিকড় বানিয়ে, আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠলাম।

সেই যে পরাগ একদিন বলেছিল ওর গরমের ছুটি পড়ে গেছে রবিবারে এবাড়িতে আসবে, ও কিন্তু এর মধ্যে একদিনও ওদিকে আসেনি। অবশ্য আমার শরীরটাও খুব খারাপ থাকায় কোনদিকে তাকানোর অবস্থা ছিলনা।তার দিন দশেক পরে দিদু সকালে বাগানে পা বাড়াতেই জানলা থেকে পরাগের ক্ষীণ গলা ভেসে এলো, 'দিদু গুড মর্নিং'। দিদু চমকে ওদের জানলার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আরে! এতদিন কোথায় ছিলি? তোকে দেখতে পাইনি।' ও জানাল, ওর জ্বর হয়েছিল। মামা বাড়ি গিয়ে অনেক বরফ খেয়েছে তো, তাই। এখনও গলায় ব্যাথা। দিদু ও ওকে খবর দিল, 'আমাদেরও একটা ট্যাঁড়শ গাছের খু-উ-ব শরীর খারাপ হয়েছিল, এখন সেরে সুরে উঠেছে। তোর মত সর্দিগর্মি লেগেছিল বোধহয়'। দিদু তো আর জানেনা আমার কী হয়েছিল, সে আমিই জানি আর জানে কেঁচো পিসি। ইঁদুর মেশো মনে হয় খেয়াল করেনি, ও

JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register

এদিকে কী কাণ্ড করে দিয়ে গেছে। না হলে এর মধ্যে একদিনও দেখা করে নিশ্চয়ই 'সরি', বলে যেত।

যাই হোক দিদুর হাতে গোলাপের তোড়া লক্ষ্য করে পরাগ জানতে চাইল, 'তোমরা ঐ জবা ফুলটা কী করবে গো?' দিদু বলল, 'কিছু না, শুকিয়ে গেছে তাই ফেলতে যাচ্ছি।' পরাগ জানতে চাইল দিদু কোথা থেকে ওটা পেয়েছে। দিদু জানাল, 'ঐ,—দাদু যেখানে বাচ্চাদের পড়াতে গেছিল, ওরা দিয়েছে।' পরাগ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'দাদু বাচ্চাদের পড়াতে যায়?' ও ছোটবেলা থেকে শুনে আসছে দাদু অফিসে গেছে, দাদু অফিস থেকে এখনও ফেরেনি, ট্রেনের গণ্ডগোল হয়েছে নিশ্চয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। এবারে ও গম্ভীর ভাবে বলল, 'ও! দাদু ভাল পড়িয়েছে বলে দিয়েছে? আমি জানি, ওটাকে জবাফুল বলেনা, প্রাইজ বলে। আমার পিণ্টু মামা পেয়েছিল। মাইকে কথা বলেছিল, তাই দিয়েছে। একটা কাপও পেয়েছিল, ফ্রি-তে!'

একটু পরে পরাগ নেমে এলো, রোগা কাঠি হয়ে গেছে, গলাটা চিঁ চিঁ করছে। ওর মনটা এত ভাল যে ওর শরীর খারাপ হলে দিদুর মোটেই ভাল লাগেনা। আমাদেরও বড্ড মন খারাপ হয়। ও এত মজাদার ছেলে যে ওকে ভাল না বেসে উপায় ও নেই।

১৮

দেখতে দেখতে বর্ষা এসে গেল। যখন তখন এক পশলা বৃষ্টি এসে সাদা জবাদের সব কাজ নষ্ট করে দিয়ে যায়। তখন ওদের দিকে তেমন করে কেউ আর তাকায় না বলে ওরা মনের দুঃখে মুখ গোঁজ করে বসে থাকে। চারি দিকে কাদা প্যাচ্ প্যাচ্ দেখ-না-দেখ রিম্‌ঝিম্ বৃষ্টি নেবে আসে। তার ফাঁকে ফাঁকে একটু রোদ উঠলেই ক'টা হলদে সবুজ পাতলা-ডানা ফড়িং আমাদের মাথার ওপরে ঠাঁই ঠাঁই করে চক্কর খেতে খেতে থাকে। আবার কখনও বা ডানা মেলে এক জায়গায় স্থির হয়ে আসে। এই খেলাটা ওরা গাছের ছায়া বাঁচিয়ে রোদের মধ্যে করতেই ভালবাসে, মনে হয় যেন মাটিতে নিজেদের ছায়া তৈরির খেলা খেলছে। মাঝে মাঝে ওরা আমার পাতার ওপরে শীর্ষাসন ক'রে সূর্য কিরণের সঙ্গে নিজের দেহটাকে বহু যত্ন করে এমন ভাবে ধরে যাতে কোন ছায়াই না পড়ে। আসলে বর্ষা এলে তো ওদের মজা হবেই, ওরা যে তখন যত জমা জলে ডিম পাড়ে।

বর্ষার জলে মাঠ ঘাট ভরে উঠলে ব্যাঙদেরও একশ মজা। শুনেছি ব্যাঙরাও নাকি পুকুরে গিয়ে ডিম পাড়ে। আমাদের ধারে কাছে কোন পুকুর নেই, অথচ এই বাগানের স্যাঁতা মাটিতে যে কত ব্যাঙের বাস তা টের পাওয়া যায় বর্ষা কাল এলে। সদ্য ডিম ফুটে বেরুনো ব্যাঙগুলো আমাদের ছায়ায় সারাক্ষণ লাফালাফি করে আর বড়দের একটু চোখের আড়াল হলেই চট করে এদিক ওদিক দেখে নিয়ে বাগানের রাস্তা পার হয়ে ওদিকের ঘাসের মধ্যে লুকোচুরি খেলতে চলে যায়। বর্ষায় বাগানের ঘাস বড্ড তাড়াতাড়ি বাড়ে বলে কেষ্টদাকে হরদম ঘাস কেটে ছোট করে রাখতে হয়। তখন ব্যাঙ আচমকা 'বাপ্পা' বলে ওর নুনের ঘাসের [illegible] উঠলে ও চমকে উঠে কাস্তে দিয়ে হাত কেটে ফেলে। তখন কেষ্টদাকে হাতে দুব্বো ঘাসের রস লাগাতে বলে। কেষ্টদা মোটেই ব্যাঙ ভালবাসে না, দেখলেই তাড়া দেয়। জানে না তো ওরা পোকা খেয়ে আমাদের কত উপকার করে। ও বলে ব্যাঙগুলোর চেয়ে সোনালী ডুরেকাটা কালো কালো কেন্নোগুলো অনেক ভাল। একটা টোকা মেরে দাও, ব্যাস অমনি গুটিয়ে একটাকার কয়েনের মত গোল হয়ে যাবে। কেষ্টদা ওদের বলে 'ধাক্কা দিলে টাক্কা'। ওরা যখন ওদের শতখানেক কুটি কুটি পা দিয়ে আমাদের ঘাড়ে চাপে, আমাদের এত সুড়সুড়ি লাগে যে কি বলব।

এদিকে মেজ ব্যাঙরা একটু বেশি লায়েক হয়ে যায়। তারা বেশ মানুষদের মত বাগানের পথ ধরে [illegible] আবার মাঝে মাঝে থপ থপ করে ছোট গেটের বাইরে চলে যায়। ওরা তো একটু বুঝতে শিখেছে তাই একটু বেশি সাবধানি হয়েছে। একটু ঘোরাঘুরি করে আবার পথ ক'রে আমাদের ছায়ায় লুকিয়ে পড়ে। এরা সবাই কুচো ব্যাঙের ছা।

এ পাড়ায় অনেক সোনা ব্যাঙও থাকে। তাদের চিনতে পারি ওদের ভারী গলার স্বরে। ওদের নিজেদের মধ্যে কথা বলাটা অনেকটা তোমাদের স্কুলে নামতা পড়ার মত। প্রতিটা দলে একজন করে সর্দার পড়ুয়া থাকে, তার গলাটা বেশি মোটা। ওদের মনে খুব ফুর্তি হলে সকলে মিলে কান ঝালাপালা করে ছাড়ে। প্রতিবার ডাক ছাড়ার সময় ওদের গলার দুপাশে গাঢ় নীল রঙের স্বরথলিগুলো একবার ফুলে ওঠে আবার পরক্ষণেই চুপসে যায়। প্রথমে ভারী গলায় সর্দার বলে, 'ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ' অমনি গোটা দল একসঙ্গে গলা মেলায়, 'মিলে আজকে খাব উচ্চিংড়ের ঠ্যাং।' এই সোনা ব্যাঙরা যখন একা একা থাকে তখন ওদের গায়ের রঙ মিলিটারি পোষাকের মত সবজে-কাদা রঙের, তাতে চিতা বাঘের মত গাঢ় রঙের ছোপ থাকে। এদের নাকের ডগা থেকে পেছন অবধি পিঠের মাঝ বরাবর পৈতের মত একটা সাদা দাগ থাকায় কেউ কেউ এদের নাম দিয়েছে 'ব্রাহ্মণ ব্যাঙ'।

কদিন টানা প্রচণ্ড গরমের পর হঠাৎ ঝির ঝির করে 'ইলশে-গুড়ি' বৃষ্টি নামলে সোনা ব্যাঙরা আর আনন্দ ধরে রাখতে পারে না। সেই সময়ে ওদের গায়ের রঙ পাল্টে উজ্জ্বল সোনা হলুদ রঙের হয়ে যায় আর ওরা যে যার দেরা ছেড়ে কাছাকাছি [illegible] জমা নিচু জলা জায়গায় গিয়ে জোটে। ওরা সবাই ঘণ্টা দু-এক হুড়োহুড়ি করে খুব গান বাজনা জুড়ে দেয়। ওদের এই মজাটা অনেকটা তোমাদের জোড়া চোর খেলার মত। ও ওকে ধরে, সে তাকে। জোড়া খুঁজে পেলে খুব আহলাদি গলায় কথা বার্তা চালায়। তখন আর তিনজনের এক জায়গায় থাকার নিয়ম নেই। আমাদের বাগান থেকেও দু এক জনকে যেতে দেখেছি। দেরি হয়ে গেলে অন্যরা খেলায় নেবেনা বলে, আমাদের পাশ কাটিয়ে তড়বড়িয়ে চলে যায়। আমাদের যেন চিনতেই পারে না, উঃ সে এক দৃশ্য, যেন সেজেগুজে ব্যাঙ পার্টিতে যোগ দিতে যাচ্ছে। সেদিনের মত খেলা শেষ হয়ে গেলে ওরা মন খারাপ করে কালচে বরণ নিয়ে ফিরে আসে আর ভাবে আবার কবে টানা গরমের পর হঠাৎ বৃষ্টি নামবে তখন ওদের সেই [illegible] উৎসব হবে। সে এক দেখবার জিনিস আর শুনবারও বটে। সামনের বছর পরাগ আর সোমের সঙ্গে তোমরাও সবাই ব্যাঙ উৎসব দেখতে আসতে পার।

ব্যাঙেরা যখন হলুদ ড্রেস পরে রওনা দেয় আমরাও মাথায় হলুদ হলুদ ফুল নিয়ে ওদের উৎসাহ দিই। এই ঝির্‌ঝির্ বৃষ্টি আর হঠাৎ হঠাৎ চড়া রোদ উঠলে আমরা সবচেয়ে আনন্দে থাকি। মাটিটা বেশ ভেজা থাকাতে আমাদের জল টেনে তুলতে খুব একটা বেগ পেতে হয় না, আবার চড়চড়ে রোদ পেলে আমাদের পাতারাও চটপট খাবার বানিয়ে ফেলতে পারে। চারপাশের এই ভেজা গুমোট গরমে আমাদের ফুল ফোটানোও আয়েসে হয়ে যায়। আমাদের জ্ঞাতি গুষ্টি ছাড়া খুব কম গাছেই বর্ষায় [illegible] সবুজের নেশা লেগে যায়। তার ভেতরে আমাদের উজ্জ্বল ফুলগুলো যা [illegible] দেয়—তোমরা দেখলেই ভালবেসে ফেলবে।

মুষলধারে টানা বৃষ্টি হয়ে রাস্তায় হাঁটু জল জমে গেলে দাদুর অফিস যাওয়া মুশকিল হয়ে যায়। কাগজওয়ালাও সময় মত কাগজ নিয়ে আসতে পারে না। দাদু তবু ওর কাছেই খবর নিয়ে নেয় শহরের কোন কোন রাস্তায় জল জমেছে, ট্রেন চলছে কিনা, অবস্থা খারাপ বুঝলে অফিস যাওয়া নেই। অমনি মীনাদির কাছে খিচুড়ি আর পাঁপড় ভাজার অর্ডার হয়ে যায়। অতি বৃষ্টিতে সব কাজই প্রায় থেমে থাকে। না পাখিদের গান গাওয়ার মুড থাকে, না আমরা ঠিকমত খাবার বানাতে পারি। কোনমতে গুটি সুটি মেরে বসে থাকা। সূর্যি মামার দেখা না পেলে সবই প্রায় অচল।

অল্প অল্প বৃষ্টিতে সোম আর পরাগ সুযোগ পেলেই মা'দের চোখ এড়িয়ে বাগানে ভিজতে ভিজতে ব্যাঙদের ভেঙিয়ে ছড়া কাটে—

'থপ্ থপ্ থপ্ ব্যাঙরা চলে শামুক গুটি গুটি
আর হিশ হিশিয়ে সাপ চলে যায়,
লাফিয়ে সবাই উঠি।'

বর্ষায় শামুক মা'রা কখনও সখনও আমাদের গোড়ায় পেঁপের সাদা বীজের মত থোকা থোকা ডিম পেড়ে যায়। ডিম থেকে কুচো কুচো বাচ্চা বেরুলে তারা অনবরত শেওলা আর নরম পাতা খেয়ে বেড়ে ওঠে। একটু বড় হলে ওরা লিলি গাছের পাতা খেয়ে ভুট্টিনাশ করে। তাতে অবশ্য লিলিগাছের বয়েই গেল। কারণ ততদিনে ওদের ফুল ফোটানোর পালা শেষ। শীত ঘুমের জন্যও অনেক অনেক খাবার বানিয়ে মাটির তলার পেঁয়াজে জমিয়ে ফেলেছে। এখন ওদের পাতা থাকলেই কী? আর না থাকলেই কী? রাত্রে শামুকরা যখন রাবণের গুষ্টির মত দলে দলে খাবার খেতে বেরোয় তখন রোজই কারুর না কারুর পায়ের তলায় একটা দুটো শামুকের খোলস গুঁড়িয়ে যায়। সকাল হলেই গুড়িং আর তার দুই বন্ধু, 'টুপ' আর 'ফোঁটা' সেইসব শামুকের মাংস দিয়ে জলখাবার সেরে নেয়। নাহলে অত সকালে কে আর ওদের মাছ দেবে বল? খেয়ে দেয়ে পেটটি নাদা করে ওরা আমাদের ছায়ায় লুকোচুরি খেলতে লেগে যায়। কখনও ওরা প্রজাপতি ধরার নেশায় মাতে আবার কখনও বা কেবল গোঁফ ফুলিয়ে পাঁয়তারা কষে। দেখতে ভারি মিষ্টি লাগে, তবে আজ অবধি কোন বেড়ালকে সত্যি সত্যি প্রজাপতি ধরতে দেখিনি। অথচ কী আজব ব্যাপার দেখ, সেদিন দাদু খবরের কাগজ থেকে মীনাদিকে ছবি দেখাচ্ছিল দিল্লীর চিড়িয়াখানায় একটা সাদা বাঘ কেমন লাফিয়ে ঈগল পাখি ধরে ফেলেছে। পরাগের ভাই প্রায়ই জানলার কাছে দুলে দুলে পড়ে, 'ইঁদুর ছানা ভয়ে মরে, ঈগল পাখি পাছে ধরে'। হায় রে! এত বড় বীর ঈগল কি কখনও জানত সাদা বাঘ ওকেই ধরে খাবে! প্রকৃতিতে এরকম খাওয়া খাওয়ি কিন্তু চলতেই থাকে। তবে বাঘরা মোটেই সব ঈগল খেয়ে ফেলেনা বা গুড়িংরা সব শামুক খেয়ে শেষ করে দেয়না। তোমরা তো অনেক মাছ, মুর্গি, পাঁঠার মাংস কত কি খাও। তাই বলে কি পৃথিবী থেকে সব মাছ লোপাট হয়ে গেছে, না

JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register

হয়ে যাবে। খেতে তো সবাইকেই হবে। না হলে বাঁচবে কী করে? আর সব খাবারই তো প্রকৃতি থেকেই আসে। প্রকৃতি মা ব্যবস্থা না করে দিলে মানুষের পক্ষে কোন খাবারই তৈরি করার জো নেই। কারুর বাড়িতে রোজ মাছ কাটা হয় আবার কারুর বাড়িতে রোজ আলু, বেগুন, পটল, মুলো [illegible] বেশি লোভী হও, প্রকৃতি মা তোমাদের, আমাদের সকলকে ঠিক বাঁচিয়ে রাখবে।

১৯

সামনের বছরে সোম ক্লাস ওয়ানে উঠবে, তাই এখন থেকেই বাড়িতে ওকে নানা ভাবে তালিম দেওয়া হচ্ছে। তাতে ইংরেজিতে কথা বলার ওর বড্ড ঝোঁক হয়েছে। একটা ছুটির দিনে সুপুরিদাদুকে পেয়ে প্রশ্ন ক'রে ক'রে উত্যক্ত করে তুলল, 'ট্যাড়শকে ইংরেজিতে কী বলে? ওর ভাল নাম কী? কে ওদের নাম রেখেছে? ওরা কোথা থেকে এলো?' এইসব। দাদু বলল, 'বা রে! সকলেরই তো নাম থাকে। না হলে এত গাছ পালা, জীবজন্তু এদের [illegible] চিনবে কী করে? আবার শুধু নাম থাকলেই হয়না একটা পদবিও থাকা চাইয। যেমন ধর তোমাদের ক্লাসে স্যার যখন 'সৌম্যদ্বীপ পাল' বলে ডাকেন, তখন তুমি 'প্রেসেন্ট প্লিজ' বলে সাড়া দাও, আবার যখন বলে 'সৌম্যদ্বীপ সেন' তখন তোমার সেই বন্ধু উঠে দাঁড়ায়, তুমি তো ওঠো না। ঠিক তেমনি গাছেদেরও সব নাম দেওয়া হয়েছে। ট্যাড়শকে ইংরেজিতে Ladies finger বলে। বলতে পার এটা ওদের একটা ডাক নাম। ওদের ভাল নাম **Hibiscus esculentus L.** প্রায় তিনশ বছর আগে ক্যারোলাস লিনিয়াস বলে একজন বিজ্ঞানী এই নাম দিয়েছিলেন।' দাদু বলছিল এছাড়াও নাকি আমাদের অনেক ডাক নাম আছে। কেউ আমাদের বলে ভিণ্ডি, কেউ বলে ওকরা, আবার কেউ বা বলে গাম্বো। এখন নাকি অন্য একজন মানুষ বিজ্ঞানী আমাদের ভালো নামটা পাল্টে বদলে দিয়েছেন—**Abelmoschus esculentus** (L.) Moench। সংস্কৃততে আমাদের বলে ভিণ্ডিশ। কি মজার নাম না? এই নামটাই আমার সব চেয়ে বেশি পছন্দ।

এতক্ষণে সোম ধৈর্য্য হারিয়ে বলল, 'উঃ বাংলায় বল না। কিচ্ছু বুঝতে পারছিনা।' যখনই ওর কোন কিছু খটমট লাগে, তখনই ও বাংলায় বলতে বলে। দাদু যতই সহজ করে বুঝিয়ে দিকনা কেন ওর সেই এক কথা। আমিও বাবা সোমের দলে, বাংলায় কথা হলে তবেই ঠিক বুঝতে পারি। ইতিমধ্যে পরাগও এসে যাওয়াতে দাদু, দিদু, পরাগ আর সোম সবাই মিলে জানলায় বসে জমিয়ে গল্প শুরু হ'ল। দাদু এবারে গল্প জুড়ল মানুষ, রুদ্রপলাশ আর ট্যাড়শকে নিয়ে। আমাদের সকলেরই আদি জন্মস্থান নাকি আফ্রিকা মহাদেশে। ভাবতে কেমন অবাক [illegible] পথ, সমুদ্র, পাহাড়, মরুভূমি পার হয়ে আমরা সকলে আবার দাদুদের এই বাগানে এসে জড়ো হয়েছি। তাই বোধহয় আমাদের এত ভাব! গরমের দেশে আমাদের আদি বাস বলে, খুব ঠাণ্ডার দেশে থাকতে আমরা মোটেই ভালবাসি না।

আমাদের এত বাড়বাড়ন্ত দেখে দিদুরা খুব খুশি। রোজ সকালে একটা বেতের ঝুড়ি নিয়ে ট্যাড়শ তুলতে আসে। এক আধটা ফল পাতার তলায় লুকিয়ে থাকলে দিদু দেখতে পায় না। পরে হয়তো বেশ বুড়ো হয়ে গেলে হঠাৎ চোখে পড়ে। কিন্তু কচি কচি ট্যাড়শ যেমন সহজেই রান্না করা যায়, বুড়ো হয়ে গেলে খেতে বড্ড কাঠি কাঠি লাগে। তখন দিদুরা বলে ভালই হয়েছে এটাকে দেখতে পাইনি, এইটা বরং বীজের জন্যে রাখা থাক। বীজের জন্য [illegible] সামনের বছরে গাছ করা যাবেনা। প্রকৃতির নিয়মই এই, বীজ থেকে সুরু আবার বীজেতেই শেষ। তবে মোটেই ভেবোনা, গাছে ফল ধরলো আর অমনি তার মধ্যে সার সার তৈরি বীজ পাওয়া যাবে। সেই রেখে দেওয়া একটা দুটো ফল ক্রমশ আরো বাড়তে থাকে। বাড়তে বাড়তে যখন আর বাড়তে পারেনা তখন তাদের গায়ের চামড়াও মোটা আর খশখশে হয়ে ওঠে। ঐ সময়ে আমাদের পাতাগুলোও আর তত সবুজ থাকে না। মাটির তলায় শিকড়রাও তেমন জুত করে জল টানতে পারেনা। আমরা বুঝতে পারি এবছরের মত তোমাদের ছেড়ে যাওয়ার সময় এসে গেছে। আমাদের ফলের [illegible] শুকোতে থাকে। শুকোতে, শুকোতে, শুকোতে, বীজগুলো এক একটা ছাই ছাই রঙের কট কটে পুঁতির মত হয়ে যায়। শুকনো লম্বা ফলগুলো তখন লম্বালম্বি পাঁচটা ভাগে ফেটে যায়। তাতে শুকনো বীজগুলো খোলা হাওয়ায় আরো শুকিয়ে ওঠে। ঠিক এই সময়ে কাসেম ভাই এর মত চাষিরা যত্ন করে আমাদের বীজগুলো তুলে রাখে। ঐ অবস্থায় শরৎ যায়, হেমন্ত যায়, শীতও চলে যায়। আমাদের বীজগুলো সারা দেহ জলতেষ্টা নিয়ে ঘুমিয়ে থাকে আর স্বপ্ন দেখে কবে আবার এমন সুন্দর একটা দাদু দিদুর বাড়ি গিয়ে মাটি থেকে চোঁ চোঁ করে জল খেয়ে মাটি থেকে মুখ তুলে সকলের সঙ্গে খেলা করবে।

JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register

হারানো উইল

আগাথা ক্রিস্টি

অনুবাদ ঃ পবিত্র সরকার

মিস্ ভায়োলেট মার্শ আমাদের কাছে যে সমস্যাটা নিয়ে এসেছিলেন সেটা আমাদের রুটিন কাজকর্মের বাইরে বেশ সুখকর এক পরিবর্তন। এই মহিলাটি একটি সংক্ষিপ্ত আর ভনিতাহীন একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন পোয়ারোকে, দেখা করবার অনুরোধ জানিয়ে। পোয়ারো উত্তরে লিখেছিল, পরদিন বেলা এগারোটায় তিনি সাক্ষাৎ করতে আসতেই পারেন।

একেবারে ঘড়ির কাঁটা ধরে তিনি এসে পৌঁছোলেন—দীর্ঘদেহিনী সুন্দরী এক যুবতী, সাদাসিধে কিন্তু নিখুঁত পোশাক, ভাবভঙ্গি প্রত্যয়পূর্ণ করিতকর্মা মানুষের। বোঝাই যায় যে মেয়েটি নিজের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে চায়, বাধাবিপদ গ্রাহ্য না করে। আজকাল যাদের 'নবনারী' বলা হয় আমি যে তাদের সম্বন্ধে খুব উচ্ছ্বসিত তা নই। ফলে যদিও মেয়েটি দেখতে সুন্দরী, তার সম্বন্ধে আমার খুব একটা অনুকূল ধারণা তৈরি হল না।

"মসিয়েঁ পোয়ারো, আমার আপনার সঙ্গে কাজটা একটু ভিন্ন ধরনের," পোয়ারোর অনুরোধে চেয়ারে বসে বলল সে, "আমি শুরুর থেকেই শুরু করি তাহলে, আর সবটা আপনাকে খুলে বলি, কেমন?"

"মাদামোয়াজেল, তাতেই আমি খুশি হব।"

"আমি শৈশবে মা-বাবাকে হারিয়েছিলাম। আমার বাবারা দুভাই, [illegible] অল্প [illegible] চাষির ছেলে। জোতজমির রোজগার বিশেষ ছিল না। তাই বড়ো ভাই অ্যান্ড্রিউ অস্ট্রেলিয়ায় [illegible] সেখানে জমির ফাটকাবাজি করে প্রচুর সম্পত্তি করেন। অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়া তাঁর পক্ষে বেশ ভালো হয়েছিল বলতে হবে। ছোটো ভাই রজার (আমার বাবা)-এর চাষবাসের ঝোঁক তেমন ছিল না। কোনোক্রমে সামান্য লেখাপড়া শিখেছিলেন তিনি। তারই বলে একটা ফার্মে ছোটো একটা কেরানির কাজ নিয়েছিলেন। আমার মা তাঁর তুলনায় স্বচ্ছল ঘরের এক গরিব চিত্রশিল্পীর মেয়ে। আমার যখন দু-বছর বয়েস তখন আমি বাবাকে হারাই, আর আমার চৌদ্দ বছরে আমার মাও বিদায় নেয়। জীবিত আত্মীয় বলতে তখন বাকি থাকেন আমার ওই অ্যান্ড্রিউ জ্যাঠামশাই। তিনি তখনে অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে এসেছেন, আর একটা জমিদার বাড়ি কিনেছেন ওই ডেভনশায়ারেরই 'ক্র্যাবট্রি ম্যানর'। ছোটো ভাইয়ের মাতৃপিতৃহীন মেয়ের উপর তাঁর গভীর স্নেহ বর্ষিত হল। তিনি আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে রাখলেন আর নিজের মেয়ের মতোই মানুষ করতে লাগলেন।

নামে 'ম্যানর', কিন্তু আসলে বাড়িটা যতটা জমিদারবাড়ি, তারচেয়ে বেশি খামারবাড়ি। চাষবাস আমার জ্যাঠামশায়ের রক্তে, তাই বাড়িটা পেয়ে তিনি চাষবাসের নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষায় মন দিলেন। আমার প্রতি তাঁর স্নেহ আর দয়াদাক্ষিণ্যের কোনো অভাবই ছিল না ; কিন্তু মেয়েদের কীভাবে মানুষ করতে হবে সে সম্বন্ধে তাঁর বেশ কিছু অদ্ভুত আর অনড় ধারণা ছিল। নিজে অতি সামান্যই লেখাপড়া জানতেন যদিও তাঁর সাংসারিক বুদ্ধি ছিল [illegible] উপর তাঁর কোনো ভরসাই ছিল না। আর মেয়েদের লেখাপড়ার তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী। তাঁর মতে মেয়েরা ঘরকন্নার কাজ করবে, গোরুবাছুরের দুধ দুইবে আর ডেয়ারি কাজকর্ম করবে, যথাসম্ভব বইপত্রের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলবে। এই সব ভাবনাচিন্তা ধরে তিনি আমাকে মানুষ করবার চেষ্টা করলেন। আমি খুব অসন্তুষ্ট আর হতাশ হলেও তিনি গ্রাহ্য করলেন না। শেষে আমি খোলাখুলি বিদ্রোহ করলাম। নিজের বুদ্ধিসুদ্ধির উপর আমার ভরসা ছিল। আর ঘরকন্নার কাজে আমার কোনো যোগ্যতাই ছিল না। জেঠুও আমার মধ্যে এ নিয়ে প্রচুর তর্কবিতর্ক হয়েছে। আমরা দুজন দুজনকে ভালোবাসতাম [illegible] পালক্রমে একটা বৃত্তি জুটে গিয়েছিল, তাই জেঠুর সাহায্য না নিয়েও লেখাপড়ায় কিছুটা এগোতে পেরেছিলাম, তিনি আমার ইচ্ছায় বাধা দেননি। কিন্তু যখন আমি বললাম যে আমি গার্টন কলেজে পড়তে যাব, তখন সংকট তৈরি হল—তিনি একেবারে বেঁকে বসলেন। যাই হোক, মায়ের রেখে যাওয়া কিছু টাকা আমার নামে জমা ছিল, আমি ভাবলাম আমার যা বুদ্ধি সামর্থ্য আছে তার চূড়ান্ত সদ্ব্যবহার আমাকে করতে হবে। শেষে জেঠুর সঙ্গে একদিন একটা শেষ, লম্বা কথাকাটাকাটি চলল। তিনি কোনো রাখঢাক করলেন না। বললেন, তাঁর যেহেতু আর কোনো জীবিত আত্মীয় নেই সেহেতু ভেবেছিলেন আমাকেই উইল করে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে যাবেন। বলেছিলেন [illegible] কিন্তু, তিনি বললেন, আমি যদি এইসব 'হালফ্যাশানের ভাবনাচিন্তা' নিয়ে চলি, তাহলে তাঁর কাছে আমি যেন এক কানাকড়িও আশা না করি। আমি রাগটাগ করিনি যেমন, তেমনই নিজের জায়গা থেকেও একচুল সরিনি। বললাম, তাঁর প্রতি আমার ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা থাকবেই, কিন্তু আমার জীবন তো আমারই জীবন, তা আমি নিজের মতো করেই বাঁচব। এইভাবেই আমরা একে অন্যের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। জেঠুর শেষ কথা ছিল, 'তোমার নিজের বুদ্ধিসুদ্ধির গুমোর খুব, তাই না মেয়ে! আমি তো জীবনে বইপত্র ছুঁইনি, কিন্তু আমার বুদ্ধির সঙ্গে টক্করে এলে তুমি কোনোদিন জিতবে ভেবেছ? এবং সেটাই আমি দেখব এবার!'

এ হল ন-বছর আগেকার কথা। আমি কখনও কখনও তাঁর কাছে শনি রবিবারের ছুটি কাটিয়ে গেছি, আমাদের সম্পর্কে হৃদ্যই ছিল যদিও তাঁর মতামত কিছুই বদলায়নি। আমি যে এর মধ্যে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেছি, এমনকি বি এসসি করেছি, এ সম্বন্ধে তিনি টুঁ শব্দ করতেন না। গত তিন বছর যাবৎ তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে আসছিল। গত মাসে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

এবার আমি আপনার কাছে আমার আসল কথাটা বলি। আমার জেঠু একটা অদ্ভুত উইল করে গেছেন। তাতে বলা হয়েছে, ক্র্যাবট্রি ম্যানর আর এর ভিতর যা অস্থাবর সবই তাঁর মৃত্যুর একবছরের জন্য আমার হবে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে আমার বুদ্ধিমতী ভাইঝিকে তার বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ দিতে হবে—উইলে এই লেখা। পরের বাক্যে আছে, যদি এমন প্রমাণিত হয় যে আমার বুদ্ধি তাঁর বুদ্ধির চেয়ে বেশি, তাহলে এক বছর পরে ওই বাড়িঘর দোর আর বিশাল সম্পত্তি নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে ভাগ হয়ে যাবে।

পোয়ারো বলল, "আপনাকে তো আপনার জেঠু মুশকিলে ফেলে দিয়েছেন। আপনি তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী, অথচ"—

"আমি ব্যাপারটা ঠিক ওভাবে ভাবছি না। অ্যান্ড্রিউ জেঠু আমাকে বেশ ভালোভাবে সাবধান করে দিয়েছিলেন, আর আমি তো আমার মত থেকে নড়িনি। আমি তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়েছি, কাজেই তাঁর সম্পত্তি যাকে খুশি দেবার স্বাধীনতা তাঁর ছিলই।"

"কোনো উকিল কি এ উইল তৈরি করেছিলেন?"

"না, একটা ছাপানো দলিলের ফর্মে উনি শর্তগুলো লিখে দিয়েছিলেন। সাক্ষী ছিল দুজন লোক, স্বামী স্ত্রী—যারা এখন ওই বাড়িঘর দেখাশোনা করে।"

"এ উইল নিয়ে আদালতে গিয়ে তা নাকচ করা ব্যবস্থা হতে পারে।"

"আমি প্রাণ গেলেও তা করব না, মসিঁয়ে পোয়ারো।"

"আপনার জ্যাঠামশাই আপনাকে একটা বুদ্ধির চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন, এই তাহলে আপনার ধারণা?"

"ঠিক ধরেছেন। আমি তো ওভাবেই বিষয়টা দেখছি।"

"হ্যাঁ, ভেবে দেখলে তাই দাঁড়ায় বটে।" পোয়ারো বলল, "ওই ভাঙাচোরা বাড়িঘরদোরের মধ্যে কোনো একটা জায়গায় আপনার জ্যাঠামশাই অ্যান্ড্রিউ মার্শ একটা বিরাট টাকা লুকিয়ে রেখেছেন, নোটের ত

JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register

কিংবা হয়তো আর একটা দলিল। একবছর সময় দিয়েছেন, যদি আপনি ওটা খুঁজে বার করতে পারেন।'

"একদম ঠিক। তবে আমি এইবার বলি মসিয়েঁ পোয়ারো। আমার হিসেবে আপনার বুদ্ধি আমার চেয়ে বেশী।"

"কী বললেন? ওহ্, ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ। আমার মাথার যে সব ধূসর কোষ আছে সব আপনারই সেবায়। আপনি নিজে কি একবার খুঁজে দেখেছেন?"

"আমি ওপর-ওপর খুঁজেছি, আমার জেঠুও কম বুদ্ধিমান ছিলেন না ; কাজটা সহজ হবে ভাবলে তাঁর প্রতি অসম্মান দেখানো হয়।"

"আপনার কাছে কি উইলটা আছে? বা কোনো নকল?"

মিস্ মার্স টেবিলের উপরে একটি কাগজ রেখে পোয়ারোর দিকে ঠেলে দিলেন। পেয়ারো তাতে চোখ বোলাতে বোলাতে মাথা নাড়তে লাগল।

"তিন বছর আগে তৈরি। তারিখ হচ্ছে ২৫ মার্চ ; আরে সময়টাও দেওয়া আছে দেখছি, বেলা এগারোটা। এটা তো বেশ অর্থপূর্ণ মনে হচ্ছে। কোথায় কতটা খুঁজব তার ইঙ্গিত হয়তো এখানে পাব। আমার নিশ্চিত ধারণা, খুঁজতে হবে আর একটা উইল। আধঘণ্টা পরে আর একটা উইল তৈরি হলেও এ উইলটা বাতিল হয়ে যাবে। বাঃ, মাদামোয়াজেল, চমৎকার একটা সমস্যা নিয়ে এসেছেন আপনি। আপনার হয়ে যদি আমি এটা সমাধান করতে পারি আমার চেয়ে সুখী কেউ হবে না। আপনার জ্যাঠামশাইয়ের বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ ছিল মানছি, কিন্তু এরক্যুল পোয়ারোর মাথার কাছে তা লাগে না।"

(সত্যি, পোয়ারোর দম্ভপ্রকাশে চক্ষুলজ্জার বালাই নেই!)

"সুখের বিষয় হল, এই মুহূর্তে আমার হাতে জরুরি কোনো কাজ নেই। তাই বন্ধুবর ক্যাপ্টেন হেস্টিংস আর আমি আজ রাত্রে ক্র্যাবট্রি ম্যানর যাচ্ছি। যে স্বামী-স্ত্রী উইলের সাক্ষী ছিলেন তারা ওখানে এখনও আছেন তো?"

"হ্যাঁ, ওদের নাম হল 'বেকার'।"

পরের সকালে আমাদের খোঁজাখুঁজি পুরোদমে শুরু হল। আগের রাতে এসে পৌঁছেছি। মিস্ মার্শ টেলিগ্রাম করে দিয়েছিলেন, মি আর মিসেস বেকার আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বেশ হাসিখুসি দম্পতি, ভদ্রলোকের গোলাপি গাল কিন্তু চামড়া শুকিয়ে আলুবোখরার মতো কুঁচকে ছোট্টোখাট্টো হয়ে গেছেন ; তাঁর পাশে তাঁর স্ত্রীর শরীরটি বিশাল, মেজাজটি ডেভনশায়ারের ধরনে শান্ত।

ট্রেনযাত্রায় ধকল, স্টেশন থেকে আট মাইল গাড়ি করে আসা, নৈশাহারে চিকেন রোস্ট, অ্যাপল্ পাই আর ডেভনশায়ারের মাখন—ক্লান্তি আর গুরুভোজনের ফলে রাতে সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকালে চমৎকার একটি ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়ে আমরা যে খাটো প্যানেল করা ঘরে বসে আছি, সে ঘরটি ছিল প্রয়াত মি. মার্শের স্টাডি আর [illegible] একটা রোলিং ডেস্ক, যার দরজা গোল হয়ে ভিতরে [illegible] যায়। তার মধ্যে থাকে থাকে খুব নিখুঁতভাবে কাগজপত্র সাজানো। পাশে ঠাসা চামড়ার বিশাল এক আরাম-কেদারা, দেখেই বোঝা যায় যে এটি ছিল এর মালিকের প্রিয় বিশ্রামের জায়গা। একটা মস্ত ছিটে ঢাকা সোফা উলটো দেয়ালে লাগানো রয়েছে। জানলার মধ্যে বসবার জায়গাগুলিই পুরোনো দিনের ধরনের ছিট দিয়ে ঢাকা।

"চমৎকার বন্ধু", পোয়ারো তার একটা ছোট্ট সিগারেট ধরিয়ে বলল, "এবার কীভাবে এগোব তার ছকটা করে নিতে হবে। এর মধ্যে আমি বাড়িটার এধার-ওধার ঘুরে নিয়েছি। তবে আমার সুনিশ্চিত ধারণা, উইলটা কোথায় আছে তার ক্লু এই ঘরেই পাওয়া যাবে। ডেস্কে যে কাগজপত্র [illegible] করে দেখব। স্বাভাবিক ভাবেই, ওই কাগজপত্রের মধ্যে উইলটা থাকবে তা আমি মোটেই বিশ্বাস করি না; কিন্তু এটা হতেই পারে যে, কোনো একটা নির্দোষ দেখতে কাগজের মধ্যেই উইলের হদিশটা পেয়ে গেলাম। যেখানে সেটা লুকোনো আছে তার। কিন্তু তার আগে আমাদের কিছু খবর জানতে হবে। ঘণ্টাটা একটু বাজিয়ে দেবে বন্ধু?"

ঘণ্টা বাজালাম। অপেক্ষা করতে করতে পোয়ারো ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিল। তার দৃষ্টিতে প্রশংসা।

"এই যে মি. মার্শ, লোকটি ছিলেন চমৎকার নিখুঁত স্বভাবের। দেখো [illegible] চিহ্ন দিয়েছেন, ভাগ করে সাজিয়েছেন ; প্রত্যেকটা ড্রয়ারের চাবির জন্যে হাতির দাঁতের লেবেল। দেয়ালে যে চিনা বাসনকোশনের আলমারি, তার চাবির লেবেলও হাতির দাঁতের। আর লক্ষ করো, কী অসাধারণ দক্ষতায় চিনামাটির বাসনকোশন সাজানো হয়েছে। দেখে মনটা খুশি হয়ে ওঠে। চোখে ধাক্কা দেয় এমন কিছু তো—"

হঠাৎ মাঝপথে পোয়ারো থেমে গেল, তার চোখ দুটো খোদ ডেস্কেরই চাবিটাতে এসে আটকে গেল। তাতে একটা এনভেলাপ ঝোলানো ছিল। পেয়ারো ভুরু কুঁচকে গেল। তালা থেকে চাবিটাকে খুলে আনল সে। খামটার উপরে লেখা "ঘোরানো ছাদ ডেস্কের চাবি", হাতের লেখাটা এবড়োখেবড়ো—অন্য চাবিগুলিতে যে সুন্দর লেখা রয়েছে মোটেই তার মতো নয়।

"এটা তো মিলছে না, বাকিগুলোর মধ্যে এটা বেখাপ্পা।" পোয়ারোর ভুরু আবার কুঁচকে গেল। আমি দিব্যি কেটে বলতে পারি, এটা মি. মার্শের ধরন নয়। কিন্তু [illegible] আর কে এসেছিল তাহলে? মিস্ মার্সই এসেছিল [illegible] আমি যতদূর বুঝি, মিস্ মার্শও [illegible] জ্যাঠামশায়ের মতোই নিখুঁত স্বভাবের মহিলা।"

ঘণ্টায় সাড়া দিতে মি. বেকার এসে দাঁড়ালেন।

পোয়ারো বলল, "দয়া করে আপনার স্ত্রীকে একটু নিয়ে আসবেন? আমার কতকগুলো প্রশ্ন আছে।"

বেকার চলে গেল, আর অল্পক্ষণ পরেই ভদ্রমহিলাকে নিয়ে ফিরল। তাঁর মুখে হাসি, হাতদুটো এপ্রনে মুছতে মুছতে এলেন।

পোয়ারো অল্প দু-চার কথায় তার এখানে আসার উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বলল। বেকার দম্পতি সঙ্গে সঙ্গে সহানুভূতির সুরে বলে উঠল, "যা মিস্ ভায়োলেটের হকের সম্পত্তি তা থেকে উনি বঞ্চিত হবেন এ আমরা মোটেই [illegible] গুলো লুটেপুটে নেবে, [illegible] নিষ্ঠুর ব্যাপার হবে।"

পোয়ারোর প্রশ্ন এগিয়ে চলল। উত্তরে বেকাররা বলল যে হ্যাঁ, উইলে সাক্ষী হিসেবে সই করার কথা তাদের স্পষ্ট মনে আছে। আগের দিন কর্তা মি. বেকারকে দুটো দলিলের ছাপা ফর্ম আনতে বাইরে পাঠিয়েছিলেন।

"দুটো!" পোয়ারোর স্বরে হঠাৎ তীক্ষ্ণতা।

"হ্যাঁ স্যার, মানে আমার মতে, বিপদের কথ কিছু তো বলা যায় না—একটা যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাই। আমরা একটাতে সই করি—"

'সময়টা ঠিক বলতে পারবেন?"

মি. বেকার মাথা চুলকোতে শুরু করলে তাঁর স্ত্রী [illegible] বললেন, "কেন, তোমার মনে নেই? আমি উনুনে কোকো বসিয়েছিলাম। তাতে ঠিক এগারোটার সময় দুধ [illegible] তারপর যখন ফিরে গেলাম তখন উনুনের ওপর দুধটুধ উপচে পড়ে একশা—"

"তারপর কী হল?"

"ঘণ্টাখানেক পরে হবে, আবার ডাক পড়ল। দুজনে আবার গেলাম। মনিব বললেন, "ওহে, একটা গণ্ডগোল করে ফেলেছি, তাই আগের দলিলটা ছিঁড়ে ফেলতে হল। কষ্ট করে আর একবার সই করে দাও দুজনে।" আমরা সই করেও দিলাম তৎক্ষণাৎ। তার পরে মনিব আমাদের দুজনকেই বেশ মোটারকম টাকা দিলেন, বললেন, দলিলে তোমাদের নামে কিছু দিইনি বটে, যে-ক বছর বাঁচব প্রতি বছরই তোমরা কিছু পাবে, আর আমি চলে গেলে তোমাদের এই টাকাই সুদে-আসলে বেড়ে বেশ ভালো দাঁড়াবে, দেখো তোমরা। আর সত্যিই তাই দাঁড়িয়েছে।"

পোয়ারো একটু ভেবে জিজ্ঞেস করল, "আপনারা যখন দ্বিতীয়বার সই করলেন, তারপর মি. মার্স ঠিক কী করলেন, মনে আছে?"

"হ্যাঁ স্যার। গ্রামে গেলেন দোকানদারদের হিসেব মিটিয়ে দিতে।"

এসব দিকে খুব সুবিধে হল না। পোয়ারো অন্য পথ ধরল, চাবিটা দেখিয়ে বলল, "হাতের লেখাটা, দেখুন তো আপনাদের মনিবের কিনা?

হয়তো আমার কল্পনা এটা, কিন্তু মনে হল বেকার উত্তর দিতে দু এক মুহূর্ত সময় বেশি নিল, বলল "হ্যাঁ, স্যার, এটা ওঁরই।"

"মিথ্যে কথা বলছে লোকটা।" আমি ভাবলাম, "কিন্তু কারণটা কী?"

"আপনার মনিব কি কখনও বাড়িটা ভাড়া দিয়েছিলেন? ধরুন গত তিন বছরে কোনো অচেনা লোক এ বাড়িতে এসে থেকেছে?"

"না, স্যার!"

"কোনো অতিথি আসেননি?"

"মিস ভায়োলেট ছাড়া আর কেউ আসেনি স্যার।"

"কোনো লোক, যে কোনো লোক—এ ঘরের মধ্যে আসেনি?"

"না, স্যার!"

এমন সময় হঠাৎ বেকার গিন্নি বলে উঠল, "জিনস সেই যে কারিগর দুজন এসেছিল, ভুলে গেছ তুমি?"

"কারিগর?" পোয়ারো আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "কীসের কারিগর?"

'বকার গিন্নি জানাল, বছর আড়াই আগে বাড়িতে টুকিটাকি মেরামতের কাজ করতে দুজন কারিগরকে ডাকা হয়েছিল। তার নিজের ঠিক ধারণা নেই কীসের মেরামতি সেটা, তার ধারণা সবটাই তাদের মনিবের বাড়াবাড়ি। মেরামতের তেমন কিছু দরকারই ছিল না। বেশ কিছু সময় ধরে কারিগর দুজন এই স্টাডিতেই টুকটাক-ঠুকঠাক করেছে। কী করেছে ঈশ্বর জানেন, কারণ ওই কাজের সময় মনিব তাদের দুজনকে এ ঘরে ঢুকতেই দেননি। না, দুর্ভাগ্যক্রমে কোন্ কম্পানি থেকে ওরা এসেছিল তা তাদের মনে নেই। শুধু এটুকু মনে আছে ওরা এসেছিল প্লিমাথ থেকে।

"হেস্টিংস, আশার ক্ষীণ আলো দেখতে পাচ্ছ?" পোয়ারো তার দুহাত ঘষতে ঘষতে বলল। "মি. মার্শ যে

JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register

একটা দ্বিতীয় উইল বানিয়েছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্লিমাথ থেকে কারিগরদের ডেকে এনেছিলেন এইকারণেই—একটা ভালো লুকোনোর জায়গা বানিয়ে নেওয়ার জন্যে। চলো বন্ধু, আমরা আর দেয়াল ঠুকে ঠুকে সময় নষ্ট করব না, প্লিমাথ যাই চলো।"

আমরা খবরটা বের করতে খুব যে একটা কষ্ট পেলাম তা নয়। দু-একবার ভুল ঠিকানায় খোঁজ করবার পর যে-কম্পানিকে দিয়ে মি. মার্শ কাজ করিয়েছিলেন সেটায় আমরা পৌঁছে গেলাম।

ওদের সব কারিগরই বহু বছর ধরে কম্পানির সঙ্গে আছে, কাজেই যে দুজন মি. মার্শের বাড়িতে কাজ করেছিল তাদের খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না। হ্যাঁ, কাজটা তাদের পরিষ্কার মনে আছে। টুকটাক অনেক কাজই তাদের করতে হয়েছিল, তার মধ্যে একটা ছিল ওই পুরোনো আমলের ফায়ারপ্লেস থেকে একটা ইঁট সরিয়ে নেওয়া, জায়গাটায় একটা গর্ত করা, তাপর ইঁটটাকে এমনভাবে ফের বসিয়ে দেওয়া যাতে জোড়ের চিহ্ন চোখে ধরা না পড়ে। আর ধার থেকে দ্বিতীয় ইঁটটা ঢোকাতে গিয়ে পুরোটা একটু উপরে তোলা হয়েছিল। কাজটা মোটামুটি ঝামেলার ছিল, আর বুড়ো ভদ্রলোক বেশ খুঁতখুঁতে স্বভাবের ছিলেন, কাজটা মনমতো না হলে ছাড়েননি। আমাদের এতসব খবর দিল যে তার নাম কোগান—দশাসই জোয়ান চেহারার, মুখে শেয়ালকাঁটার মতো গোঁফ। তার কথাবার্তা বেশ বুদ্ধিমান লোকের মতো।

আমরা বেশ খোশমেজাজে ক্র্যাবট্রি ম্যানরে ফিরে এলাম। স্টাডিতে ঢুকে পোয়ারো সাবধানে দরজাটা বন্ধ করল, এবং সন্ধান শুরু করল। ফায়ারপ্লেসের দেয়াল দেখে কারও বোঝবার সাধ্য নেই যে কোন্ ইঁটের ভিতরটা ফাঁপা, কিন্তু কারিগরের কথা মনে রেখে, ঠেলতে ঠেলতে একটা ইঁট একটু সরে গেল। সেটা টেনে বের করতেই একটা গর্ত বেরিয়ে পড়ল।

চোখেমুখে দারুণ উল্লাস নিয়ে পোয়ারে হাতটা ঢুকিয়েছিল, কিন্তু দেখতে দেখতে সে উল্লাস নিভে গেল, মুখে অবাক হতাশা ফুটে উঠল তার। হাতটা বার করে আনল, কিন্তু সে হাতে একটা পোড়া কাগজের ছোটো টুকরো, শক্ত কাগজ মাত্র।

"যা বাবা। আমাদের আগেই কেউ এটার খোঁজ পেয়েছে।" পোয়ারো বেশ দমে গিয়ে বলল।

আমরা টুকরোটা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলাম। বোঝাই গেল, যে দলিলটা আমরা খুঁজছিলাম এটা সেই দলিলেরই টুকরো, কিন্তু বেকারের সইয়ের অবশিষ্ট চিহ্ন ছাড়া তার আর কিছুই বাকি নেই। কী শর্ত ছিল, কাকে কী দেওয়া হল, কিছুই না।

পোয়ারো মেঝেতে বসে পড়ল। তার মুখ দেখে আমার হাসি পাবারই কথা, কিন্তু ওই হতাশা আমার হাসিকে আটকে রাখল। "কী ব্যাপার, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। পোয়ারো [illegible] দুশ্চিন্তা—"এ দলিল কে নষ্ট করল?"

[illegible] পোয়ারো [illegible] গিয়েনি তো?"

"কোন্ কর্মে?" পোয়ারো ভুরু কোঁচকাল, "দুটোর কোনোটাতেই ওদের কিছু দেওয়া হয়নি। আর দ্বিতীয়ত, হাসপাতালে সম্পত্তি যাওয়ার চাইতে মিস্ মার্শের হাতে এলে তো ওদেরই লাভ, ওদের হয়তো উনি এখনকার কাজেই বহাল রাখবেন। ফলে এ উইল পুড়িয়ে ফেললে কার লাভ হবে? হ্যাঁ, হাসপাতালের লাভ হতে পারে। কিন্তু একটা হাসপাতাল এসে উইল পোড়াবে, এ কী ভাবা সম্ভব?

"এমন হতেই তো পারে," আমি বললাম, "যে [illegible] ভদ্রলোক নিজেই [illegible] উইলটা পুড়িয়ে [illegible]?"

"হেস্টিংস, মাঝে মাঝে তুমি বেশ বুদ্ধিমানের মতো অনুমান করো," পোয়ারো বলল, "এটা সেইরকম একটা অনুমান, যাই হোক, এখানে এখন আমাদের আর কিছু করবার নেই। সাধ্যের মধ্যে যা ছিল সবই আমরা করেছি। অ্যানড্রিউ মার্শের বুদ্ধির সঙ্গে আমাদের বুদ্ধির টক্করে আমরা হারিনি ঠিকই কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর ভাইঝির তাতে কিছু লাভ হচ্ছে না। চলো তল্পিতল্পা নিয়ে বিদায় নিই।"

সঙ্গে সঙ্গে স্টেশনে গাড়ি ছুটল, আর আমরাও অনেক কষ্টে লণ্ডনের একটা ট্রেন ধরে ফেললাম। এমন [illegible] তার মনটা একেবারে দমে আছে। আমিও খুব ক্লান্ত, এক কোণে একটা সিটে ঘুমোবার চেষ্টা করেছিলাম। হঠাৎ ট্রেনটা যখন টন্টন স্টেশন থেকে আস্তে আস্তে বেরোচ্ছিল তখন পোয়ারো প্রায় একটা অমানুষিক চিৎকার করে উঠল।

"আরে হেস্টিংস্! জাগো, ওঠো! লাফাও। এখুনি লাফিয়ে নামো!"

"কী! কেন!" বলতে না বলতেই পোয়ারো আমার হাত ধরে এক হ্যাঁচকায় তুলে লাফিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল। দুজনের কারও মাথায় টুপি নেই, ট্রেন আমাদের টুপি আর সুটকেস-টেস নিয়ে অন্ধকারে উধাও হয়ে গেল। আমার মাথা গরম হয়ে গেল, কিন্তু পোয়ারোর তাতে ভ্রুক্ষেপই নেই। "আমি একটা গাধা!" পোয়ারো নিজের মনেই বিড়বিড় করছে, "গাধারও অধম! আমার মাথায় গ্রে সেল নিয়ে জীবনে আর অহংকার করব না!"

আমি বললাম, "এ তো চমৎকার কথা! কিন্তু এত হট্টগোল কী নিয়ে?"

[illegible] পোয়ারো আমার কথায় কান দিল না। বলল, "দোকানিদের হিসেবের খাতা! ব্যাপারটা নিয়ে আমি মাথাই ঘামাইনি। গাধা আর কাকে বলে!" পোয়ারো নিজেকে গালাগাল দিতে দিতে নিজেকেই প্রশ্ন করল, "কিন্তু কোথায়? কী ভাবে?" তারপর নিজেই বলল "যাক গে সে সব কথা। এবারে আর ভুল হয়নি। আমাদের এক্ষুনি ক্র্যাবট্রি ম্যানরে ফিরতে হবে।"

"ফিরতে হবে" বলা তো সহজ, করা তো অত সহজ নয়। এগ্‌মিটার যাচ্ছে এমন একটা ধ্যাদ্ধেড়ে ট্রেন ধরলাম আমরা, সেখান থেকে পোয়ারো একটা গাড়ি ভাড়া করল। নিশুতি ভোরে আমরা যখন আবার ম্যানরে পৌঁছোলাম তখন বেকারদের ডেকে তোলাটাই একটা [illegible] আমাদের দেখে হতবাক। কিন্তু পোয়ারো যথারীতি কাউকে পাত্তা না দিয়ে সোজা স্টাডিতে চলে গেল।

"ছত্রিশটা গাধা মিলেও আমার মতো বুদ্ধু হবে না" নিজেকে এই শংসাপত্র দিয়ে পোয়ারো বলল, "নাও বন্ধু, এই দ্যাখো!"

সোজা ব্যুরোর ডেস্কে গিয়ে সে ড্রয়ার থেকে চাবিটা খুলে আনল, তার সঙ্গে ঝোলানো এনভেলপটা খুলে নিল। আমি বোকার মতো চোখ করে তার কাণ্ড দেখছিলাম। ও কি আরও একবার গাধা বনতে চায়? ওইটুকু খাম থেকে সে কী করে আস্ত সাইজের একটা উইল বার করবে? খুব সাবধানে যত্ন নিয়ে সে খামের মুখটা কেটে সেটাকে একটা খোলা কাগজের মতো করে টেবিলের উপর পাতল। তারপর একটা মোমবাতি [illegible] কাগজটা তার কাছে ধরল, মুহূর্তের মধ্যে তাতে কিছু লেখা ফুটে উঠল।

সে আবার বলল, "দ্যাখো বন্ধু!"

দেখলাম বটে। ম্লান হয়ে আসা হাতের লেখার কয়েকটা লাইন ফুটে উঠল—অ্যানড্রিউ তার সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি তার ভাইঝিকে, ভায়োলেট মার্শকে, দিয়ে যাচ্ছেন। তারিখ ২৫ মার্চ, বেলা ১২.৩০। সাক্ষী হিসেবে সই করেছে রুটিওয়ালা অ্যানবার্ট পাইক আর তার স্ত্রী জেসি পাইক।

আমি বিস্ময় চেপে বললাম, "আইনের চোখে এ উইল সিদ্ধ?"

"আমি যদ্দুর জানি, আইনে এমন কিছুই নেই যে তুমি অদৃশ্য কালিতে তোমার উইল লিখতে পারবে না। যিনি উইল করছেন তাঁর মনের ইচ্ছা স্পষ্ট, আর যিনি পাচ্ছেন তিনি তাঁর একমাত্র জীবিত উত্তরাধিকারী। কিন্তু লোকটার অসাধারণ বুদ্ধি দ্যাখো! উইল খুঁজতে আমরা অতিমূর্খ গাধার মতো ঠিক কী কী করব, কেন্ পথে এগোব, সে আগে থেকে প্রত্যেকটা ধাপ ভেবে রেখেছে। ভদ্রলোক দুটো উইলের কাগজ কিনিয়ে আনলেন, বেকারদের দিয়ে দু-বার সই করালেন, তারপর ওই নোংরা এনভেলপের মধ্যে অদৃশ্য কালির একটা ফাউন্টেন পেন দিয়ে নতুন একটা উইল লিখে ফেললেন। তাঁর নিজের সইয়ের নীচে রুটিওয়ালা আর তার বউ সই করল, তাদের কী বুঝিয়েছিলেন কে জানে! তারপর এনভেলাপটা ডেস্কের চাবির সঙ্গে লাগিয়ে মনে মনে হাসতে লাগলেন। দেখি, কার কত বুদ্ধি! ভাইঝি যদি এটা খুঁজে পড়তে পারে তাহলে সে তো সম্পত্তি পাওয়ার যোগ্যই ধরতে হবে, তার শিক্ষাদীক্ষা ঠিক পথেই এগিয়েছে, তার প্রাপ্য সে ভোগ করুক।"

আমি একটু তর্কের সুরে বললাম, "কিন্তু ভাইঝি তো আর এটা উদ্ধার করেনি, ভদ্রলোকের বুদ্ধিই তো জিতল। ওর কি সম্পত্তি পাওয়া উচিত?"

"একশোবার উচিত, হেস্টিংস! তোমার এ নিয়ে ভাবনাটাই ভুল।" পোয়ারো বকুনির সুরে বলল, "আসলে মিস্ মার্শের বুদ্ধির জিত কোথায় জান? আর এতে প্রমাণও হল যে মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার দরকার আছে। তিনি যে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আমার কাছে এলেন এটাই তাঁর বুদ্ধি আর শিক্ষাদীক্ষার প্রমাণ। কঠিন কাজ বা সূক্ষ্ম কাজ—বিশেষজ্ঞের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকো। মেয়েটি সম্পত্তির উপরে তার দাবি প্রমাণ করেছে আমার হাতে পুরো ব্যাপারটা ছেড়ে দিয়ে।"

এ কথা শুনে ভাবতে লাগলাম, আচ্ছা, এই কথাগুলো অ্যানড্রিউ মার্শ শুনলে কী বলত!

ছবি: রাজন মজুমদার

JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register

অশরীরী বক্সিং

প্রসাদরঞ্জন রায়

[আর্থার কনাল ডয়েল-এর 'দ্য বুলি অফ ব্রোকাস কোর্ট' অবলম্বনে]

অনেক বছর আগের কথা। সালটা ১৮৭৮ হবে। তখন সাউথ মিডল্যাণ্ড রেজিমেন্ট-এর কেন্দ্র ছিল বেডফোর্ডশায়ারেলুটন শহরে কাছে। ঐ রেজিমেন্টে বার্টন নামে এক সার্জেন্ট ছিল খুব শক্তিশালী আর বিকট চেহারার। বক্সিং লড়তে ওস্তাদ ছিল সে, আর দুটো হাতই সমান চলত। রেজিমেন্টাল চ্যাম্পিয়ন তো ছিলই, ওর সঙ্গে দশ রাউণ্ড লড়ার মতন ক্ষমতা বোধ হয় গোটা ইংল্যাণ্ডে কারুর ছিল না। অন্তত সে অঞ্চলে তাই ধারণা ছিল সবার।

তা নিয়েই দাঁড়াল সমস্যা। 'বক্সিং রিং'-কে ঘিরেই সবার জীবন, আর কোনো খেলাধূলার তেমন চল ছি না। তখন পেসাদারি বক্সিং-এর তেমন নিয়মকানুন হয় নি, খালি হাতে বক্সিং লড়া নিষিদ্ধ হয়ে গেছে বহু বছর আগেই, মার্কুয়েস অফ কুইন্সবেরী কিছু নিয়ম চালু করেন যাতে মুষ্টিযুদ্ধ থেকে কুস্তির লড়াই নিষিদ্ধ হয়। অর্থাৎ প্রায় চল্লিশ বছর ধরে বক্সিং তখন বিশুদ্ধ মুষ্টিযুদ্ধ। কিন্তু বক্সিং চলত বাজির টাকায়। সাধারণ মানুষ থেকে আরম্ভ করে ব্যারণ, ডিউধ প্রভৃতি সকলেই বাজি ধরতেন আর বাজির টাকার একটা অংশেই বক্সিং-এর খরচপত্র মিটত।

সমস্যাটা হল এই, যে তামাম মধ্য বা উত্তর ইংল্যাণ্ডে, এমন কি স্কটল্যাণ্ডেও বার্টনের সঙ্গে লড়বার মতন বাহাদুর মুষ্টিযোদ্ধা পাওয়াই যাচ্ছিল না। তাহলে বাজিটা জমবে কী করে? সবাই বার্টনের উপর বাজি ধরতে রাজি, তার বিরুদ্ধে কেউ বাজি ধরবে না। তা হলে উপায়টা কী? ঐ অঞ্চলের মাতব্বররা ধরলেন ব্যারনেট স্যার ফ্রেড মিলবার্নকে। তিনি স্থানীয় জমিদার এবং বক্সিং-এর বড় পৃষ্ঠপোষক। সকলের অনুরোধে তিনি রাজি হলেন লণ্ডন থেকে কার্টনের সঙ্গে লড়াই করার উপযুক্ত কোনো বক্সারকে ধরে আনতে।

কাজটা কিন্তু সহজ হল না। মিলবার্ন দেখলেন সে সময় লণ্ডনেও বক্সারদের যেন আকাল পড়েছে। যে ক'জন হেভিওয়েট বক্সার দেখলেন তাদের কারুকেই তাঁর পছন্দ হল না। এরা কেউই বার্টনের সঙ্গে এক রাউণ্ডও টিকবে না। খুঁজতে খুঁজতে তাঁর নজরে পড়ল অ্যাল্‌ফ স্টিভেন্স নামে এক মুষ্টিযোদ্ধা। স্টিভেন্স বেশ লম্বা, কিন্তু মিডলওয়েট। চেহারাটি মিলবার্ণের মনে ধরল। ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি লম্বা, পেটানো চেহারা, মাংসপেশীগুলি সুগঠিত আর, [illegible] সবচেয়ে ভালো লাগল, তা তার [illegible] চোখের নির্ভীক চাউনি। শুনলেন, সে নাকি এ পর্যন্ত কোনো বক্সিং ম্যাচে [illegible] তার মাথায় আসেই না। মিলবার্ণ তাকে বললেন "ও হে, লুটন শহরের কাছে একজনের সঙ্গে লড়তে হবে। সে কিন্তু মাথায় ইঞ্চি দুয়েক লম্বা আর ওজনেও প্রায় বিশ পাউণ্ড বেশী। কী মনে হয়, পারবে?" স্টিভেন্স বলল, "হুজুর, এ সমা কাউকে ডরায় না। দু-পাঁচজন হেভিওয়েটকেও পিটিয়ে খতম করেছি। এখন আর কেউ লড়তেই আসে না। এই বড় আপশোস।"

মিলবার্ণের মনে ধরে গেল। দেনা-পাওনার কথা ছুকিয়ে দুদিন বাদে তাঁরা সন্ধ্যায় গোল্ডেন ক্রস নামে এক সরাইখানায় দো[illegible] রওনা হলেন। লুটন লণ্ডন থেকে মাত্র ৩০ মাইল দূর আর ব্যারনেট মিলবার্ণ ছিলেন দক্ষ ঘোড়সওয়ার ও ঘোড়ার গাড়ির চালক। সন্ধ্যার মুখে বেরিয়ে মাঝরাতের আগেই পৌঁছবার ইচ্ছা ছিল তাঁর। মিলবার্ণ ঘোড়ার গাড়ি চালাছিলেন, তাঁর পাশে বসেছিল স্টিভেন্স আর পিছনে ছিল তাঁর সহিস বেটস। লণ্ডন শহরের চৌহদ্দি বেশ সাবধানে পেরিয়ে উত্তরমুখী সড়ক ধরলেন মিলবার্ণ। তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে।

স্টিভেন্সকে যত দেখছিলেন, ততই ভালো লাগছিল মিলবার্ণের। "তুমি লড়াইয়ের জন্য একদম তৈরি তো?" মিলবার্ণ জিজ্ঞাসা করলেন। স্টিভেন্স বলল "স্যার, আমি সব সময়ই তৈরি থাকি। গত সপ্তাহে একটা লড়াই হবার কথা ছিল, সেজন্য ট্রেনিংও করেছি কিন্তু হতভাগা না লড়ে পালাল। আমিও তাই একেবারে তৈরি।"

ওঁরা যখন ফিঞ্চলি ছাড়াচ্ছেন, তখন রাত বেশ ঘনিয়ে এসেছে। হঠাৎ মিলবার্ণ বললেন "আজ যদি গুণ্ডাটা বেরোয়, তবে বেশ হয়।" স্টিভেন্স বলল "সে আবার কে?" মিলবার্ণ বললেন "ওর নাম তো কেউ জানে না। একটু আগে ঐ পুরোনো ব্রোকাস কোর্টের সামনে চাঁদনি রাতে মাঝে মাঝে ওর দেখা মেলে বলে ওকে বলা হয় ব্রোকাস কোর্টের গুণ্ডা। কেউ বলে ও ডাকাত, কেউ বা বলে স্রেফ গল্প-কথা! তবে ওর হাতের কাজ তো আর গল্প কথা নয়! চাঁদনি রাতে ও নাকি এ পথে যাত্রীদের বক্সিং ম্যাচে চ্যালেঞ্জ করে। ও আবার পুরোনো আমলের মতন খালি হাতে বক্সিং লড়ে। বেড়ে বক্সার কিন্তু! জেম

অ্যাড্রজ এ অঞ্চলের বেশ ভালো বক্সার, কিন্তু তাকেও মেরে মুখ বিচ্ছিরিভাবে ফাটিয়ে দিয়েছে। আরো জনা তিনেক বেধড়ক মার খেয়েছে, দুজন নাকি মারাও গেছে। আশ্চর্য এই, যে ডাকাতি ও করে না, আর হার স্বীকার করলে নাকি ছেড়ে দেয়। ওর সঙ্গে আর একজন থাকে, সে কিন্তু বক্সিং লড়ে না—শুধু কথা বলে।"

খুব উৎ[illegible] বলল, "একবার বাছাধনকে পেলে হয়। খালি হাতে বক্সিং লড়ার আমার অনেক দিনের ইচ্ছা। একবার দেখি চেষ্টা করে! তবে সে যদি অত ভালো বক্সারই হবে, তবে বক্সিং-এর লোজন তো ওকে চিনেই ফেলত!" একটু থেমে আবার বলল "স্যার, আজকেই তো পূর্ণিমা!" তার মুখের কথা শেষ না হতেই মিলবার্ণ বিরক্ত গলায় বলে উঠলেন "আরে, আরে, হচ্ছে টা কী?"

ঠিক সেই জায়গাটা ছিল অন্ধকার, দুধারে বড় বড় গাছ আর রাস্তাটা একটু নীচু হয়ে গেছে। ডান দিকে একটা ঘাসে ঢাকা রাস্তা চলে গেছে, ব্রোকাস কোর্টের গেটের দিকে। সে বাড়িও অব[illegible] রাস্তাটা ঝোপঝাড়ে ভর্তি। ঠিক সেখানে বাঁকের গাছের পিছন থেকে [illegible] চেপে ধরল। লোকটার পোশাক-আশাক অদ্ভুত, পরণে একটা লম্বা জোব্বা ধরণের, বেশ বলিষ্ঠ গড়ন। কিন্তু তার সঙ্গীকে দেখলে আর চোখ ফেরানো যাবে না। সে ছিল ডান দিকের গাছের পাশে। তার পোশাকও অদ্ভুত, সেকেলে ধরণের—মাথায় বীজ্জার হ্যাট, পরণে ওভারকোট, পায়ে ব্রিচেস, তার নীচে বুট। লোকটা বেশ লম্বা, দেখলেই বোঝা যায় খুব বলশালী কিন্তু তার মুখের দিকে দেখলে যে কারুর ভয় হবার কথা। চোখ দুটো হিংস্র, জ্বলজ্বল করছে, পুরু ঠোঁটে একটা নৃশংস ভাব—এলোক কারুর কাছে ক্ষমা চাইবে না, কারুকে ক্ষমা করবেও না।

দুজনের [illegible] বলল "আরে, জো, এটা তো একটা ফুল বাবু, এ আবার লড়বে [illegible] চেহারা [illegible] লড়াই জমতে পারে।" যথেষ্ট বিরক্ত হয়ে ব্যারনেট বললেন, একী গুণ্ডামি নাকি? মহারাণীর রাস্তায় গাড়ি থামানো! আমাকে ঘাঁটিও না বলছি।" লোকটা ঠোঁট উলটে বলল "এসব কথা ছাড়ো। তোমাদের দুজনের মধ্যে একজন আমার সঙ্গে লড়াই না করলে এখান থেকে একপাও লড়তে দেব না।" তখন স্টিভেন্স এক লাফে ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমে বলল "লড়তে চাও তো আশ মিটিয়ে দেবো। কিন্তু আগেই বলছি আমি পেশাদার বক্সার। চোট লাগলে আমাকে দোষ দিও না।"

এবার লোকটা সজোরে হেসে উঠে বলল "দেখলি জো, বলেছিলাম। এ লোকটা লড়াই জানে। আজকে জমবে ভালো। তবে ছোকরা, আজ তোমার দফা শেষ। শোনো নি, লর্ড লংমোর বলতেন, আমাকে হারাতেপারে এরকম লোক এখনো জন্মায় নি। কী, ভয় পাচ্ছো নাকি?" লর্ড লংমোর-এর নাম স্টিভেন্স কেন, ব্যারনেট মিলবার্ণও কখনো শোনেন নি। জো বলে লোকটা হঠাৎ বলল, "সে অবশ্য 'বুল' আসবার আগে"। তখনি এ প্রায় গর্জন করে বলল " 'বুল'-এর কথা থামাও তো। ঐ একবার যে আমাকে হারিয়েছে বটে, কিন্তু আরেকবার তার দেখা পেলে....কি হে ছোকরা, কেমন বুঝছো?"

স্টিভেন্স বলল "কথা তো তুমিই ভালোই বলো, একেবারে বাক্য-নবাব!" "মানে?" জিজ্ঞাসা করল লোকটা। স্টিভেন্স বলল "নানারকম গ্যাস দিয়ে যাচ্ছো তো!" কথাটা শুনেই লোকটা যেন চমকে উঠল। বলল, "গ্যাস! হ্যাঁ হ্যাঁ, গ্যাসই বটে। টেরটি পাবে এখুনি। এই বেলা কাজটা সেরে ফেলি। এখনো চাঁদের আলো আছে। এর পর মেঘে ঢেকে ফেলতে পারে।" "তাই চলো" বলল স্টিভেন্স। ব্যারনেট তখনো বেশ মজাই পাচ্ছিলেন—এই লোকটা একটু বাদে স্টিভেন্সের হাতে কীরকম শিক্ষা পাবে সেকথা ভেবে।

অন্য লোকটারও তখন লাগাম ছেড়ে ব্রোকাস কোর্টের গেটের দিকে রওনা দিল। ব্যারনেটের সহিস বেট্‌স লাগাম ধরে ঘোড়াদুটোকে সামলাচ্ছিল, কিন্তু ঘোড়াদুটো খুই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। "যাচ্ছো কোথায়? এই রাস্তার উপরেই তো লড়াই হতে পারে" বললেন মিলবার্ণ। কিন্তু লোকটা বলল "তাই কি হয়? একী তোমার সঙ্গে লড়াই! দুজন দক্ষ মুষ্টিযোদ্ধার লড়াইয়ের জন্য উপযুক্ত জায়গা চাই তো!" তার সঙ্গী তখন ব্রোকাস কোর্টের বড় গেটটা খুলছে। ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হল আর মিলবার্ণের মনটা যেন ছ্যাঁত করে উঠল।

গেট পেরিয়ে ঢুকতেই চারদিক নিস্তব্ধ, কেবল একটা পেঁচার ডাক শোনা গেল। ব্রোকাস কোর্টের বিরাট বাড়িটা পেড়ো হয়ে পড়ে আছে। কেমন যেন লাগল স্টিভেন্সের। রাস্তাটা পেরোতেই একটা উঁচু ঘাসজমি, ঠিক বক্সিং রিং-এর আয়তনেই। সেটা দেখে স্টিভেন্সের ভলো লাগল। হ্যাঁ, এটা লড়াইয়ের উপযুক্ত জায়গা বটে।

এবার লোকটা বলে উঠল "জামাকাপড় খোলো। খালি হাতের লড়াই কিন্তু, ঐ বাবুমশাইদের মতন গ্লাভ্‌স পরে নয়!" "হাঁ হাঁ, তাই হবে" বলল স্টিভেন্স। দুজনেই জামাকাপড় খুলে খালি গায়ে তৈরি। এবার যেন খালি গায়ে লোকটাকে আরো বিশলাকৃতি লাগছিল। তখনো

JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register

তার মাথায় সেই বিরাট হ্যাটটা। হ্যাটটা খুলতেই স্টিভেন্স বলে উঠল "একী! কী হয়েছে? তোমার মাথায় চোট লেগেছে!" ব্যারনেটেরও নজরে এল ঠিক কপালের উপরে একটা দগদগে ঘা, একটা ভারি অস্ত্রের টোরে যেমন হয়। এতে লোকটা আরো খেপে উঠল, "আমার মাথা দেখতে হবে না, নিজের মাথা সামলাও"। জো বলে লোকটা এবার হেসে উঠল : "সাবাস, টমি! ঠিক বলেছো!"

টমি বলে লোকটা তৈরি হয়ে দাঁড়াল। তার মুখোমুখি দাঁড়াল স্টিভেন্স। একটা গা-ছমছমে ভাব, যদিও ভয়-ডর কাকে বলে তা স্টিভেন্স জানেই না। লড়াই আরম্ভ হল। একটু বাদেই বোঝা গেল, টমি বলেলোকটা প্রচণ্ড শক্তিশালী, তবে স্টিভেন্স-এর গতি ওর থেকে বেশী।

দু-চারটে ঘুষির আদান-প্রদান, একটু নড়াচড়ার পরেই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। লোকটা বুনো মোষের মতন আক্রমণ করে দুহাতে স্টিভেন্সকে জড়িয়ে ধরে শূন্যে তুলে মাটিতে আছড়ে ফেলে তাকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল।

রাগে ফুঁসে উঠে স্টিভেন্স বলল, "এ আবার কি ছোটলোকি কা[illegible] লোকটা বেশ অবাক হয়ে গেল "ফাউল আবার কী? কোন্ নিয়মকানুন [illegible] "মাকুয়েস অফ কুইন্সবেরীর নিয়ম!" লোকটা ঠোঁট উলটে বলল "কোনোদিন নামই শুনি নি। আমরা মানি লণ্ডন প্রাইজ-রিং-এর নিয়ম"। রেগে উঠে স্টিভেন্স বলল "ঠিক

আছে, [illegible] ব্যারনেট তাদের থামিয়ে বললেন "দাঁড়াও। তনি মিনিটের দশটা রাউণ্ড তো?" লোকটা যারপরনাই অবাক হয়ে বলল "রাউণ্ড! সে আবার কী? খেলা চলবে শেষ অবধি—হয় মৃত্যু, নয় হার স্বীকার। তবে মাঝেমধ্যে একটু বিশ্রাম চলতে পারে"।

এবার যে লড়াই আরম্ভ হল তাকে অবিশ্বাস্য বললেও অত্যুক্তি হবে না। কোনো বিরতি ছাড়াই এ ওর দিকে ছুটে আসছে। ঘুষি [illegible] সারিয়ে নিচ্ছে, সুযোগ পেলেই একে অন্যকে শূন্যে তুলে আছাড় মারছে। লোকটার দৈহিক শক্তি প্রচণ্ড এক কথা বারেবারেই বোঝা গেল, তবে স্টিভেন্সও অসাধারণ যোদ্ধা—তার গতি ও মনের জোর নিঃসন্দেহে খুব উঁচু দরের। এমনি চলতে চলতে মধ্য রাত পেরিয়ে যাবার পর লোকটা বিশ্রাম চাইল। ঢালু ঘাসের পাড়ে তার বন্ধুর পাশে বসল। স্টিভেন্স এসে বসল ব্যারনেটের পাশে। তার নাক ফুলে গেছে, কানের পাশ থেকে রক্ত ঝরছে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে ওর অনেকগুলো সজোর ঘুষি ওর প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখে লাগলেও তার মুখে কোথাও রক্তের চিহ্ন নেই।

নিজের [illegible] ভিজিয়ে স্টিভেন্সের মুখ পরিষ্কার করতে করতে ব্যারনেট বললেন "ওকে দূরে দূরেই [illegible] বলল "কিসে আমার সুবিধা আমি জানি না। তবে হার মানব না, সাধ্য মতন লড়াই করে যাবো।" একটু থেমে আবার বলল "লোকটার গায়ে সিংহের শক্তি। আর ও জানেও অনেকরকম কায়দা, কিন্তু শিখল কোথায়?"

এবার যে লড়াই আরম্ভ হল তার কোনো নজির ব্যারনেটের জানা ছিল না। লোকটা মারাত্মক জোরে ঘুষি মারছিল আর স্টিভেন্সের পালটা ঘুষিতে যেন ওর কিছু হচ্ছিল না। মুখে সব সময় মাখা ছিল একটা ব্যাঙ্গাত্মক হাসি। মাঝে মাঝে বলছিল "সাবাস ছোকরা! আজকের লড়াই জমে গেছে!"

রাত দুটোর [illegible] একটা জোরালো আপার-কাট থুতনিতে খেয়ে ছিটকে পড়ল স্টিভেন্স। ওর [illegible] বলল "সাবাস, টমি! এরকম আরেকটা লাগালেই এ ব্যাটা সাবাড়!" ব্যারনেটের কাছেও তখন এই মারাত্মক খেলার ফলটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তিনি স্টিভেন্সকে বললেন "যথেষ্ট হয়েছে, বরং হার স্বীকার করে নেওয়া ভালো।" স্টিভেন্স কিন্তু অটল "হার স্বীকার? কখনো না। তার চাইতে মৃত্যু ভালো।"

এর পরে কোথা থেকে যেন শক্তি সংগ্রহ করে প্রতি-আক্রমণে গেল স্টিভেন্স। তার ডান ও বাঁ হাতের অনেকগুলো মারাত্মক মার আছড়ে পড়ল লোকটার মুখে। একবার লোকটা ছিটকে পড়েও গেল। আবারউঠল। কোনো প্রভাবই যেন ওর উপর পড়ছে না। ক্লান্তির কোনো চিহ্নই নেই ওর মুখে। কিন্তু স্টিভেন্স স্পষ্টতই ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। আরো দুবার সে ঐ মারাত্মক ঘুষির ঘায়ে ছিটকে পড়েছে, অবশ্য নক আউট হয় নি। আবার উঠেছে, কিন্তু গতি কমে এসেছে। বাঁচোখের উপরটা ফোলা, দেখতে পাচ্ছে কিনা সন্দেহ, সারা মুখ ফালাফালা করে কেটে গেছে। তবু সে হার মানবে না। তবে ব্যারনেট নিশ্চিত যে আর কয়েক মিনিটের ব্যাপার। তার পর তাঁর নির্বাচিত অপরাজিত মিডলওয়েট চ্যাম্পিয়নের খেলা শেষ! হয় তো বা চিরতরেই!

ঠিক তখন একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। ডানদিকের গাছপালার ফাঁক থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ ভেসে এল, যেন কোন জন্তুর করুণ আর্তনাদের মতন। টমি বলে লোকটা তখন স্টিভেন্সকে একেবারে কোন-ঠাসা করে ফেলেছে, মরণ-ঘা দেয় আর কী! ঐ আওয়াজটা শুনেই দুপা পিছিয়ে গেল, চোখদুটো যেন ভয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। "জো, ঐ আসছে, আসছে! আমায় ধরল" বলে আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল। ওর সঙ্গী বলল "টমি, আর দু মিনিট! এ লোকটা তো খতম হয়ে এসেছে। ওটা আর তোমার কী ক্ষতি করবে?" টমির উত্তর শোনা গেল "করবে, করবে! আমি ওর সামনে দাঁড়াতে পারবো না!" বলতে বলতেই যেন দারুণ ভয়ে সে ছুট দিল। পিছু পিছু গেল তার সঙ্গীও।

স্টিভেন্স তখন টলছে। কোনো মতে ব্যারনেট তাকে দুহাতে ধরেছেন। তখনই তাঁরা দেখলেন যে ঝোপঝাড় ভেঙে একটা ছোট্ট টেরিয়ার কুকুর বেরিয়ে এসেছে। ওঁদের দিকে সে দেখলও না, ঐ রকম আর্তনাদ করতে করতে টমি আর জো'র পিছনে পিছনে দৌড়ল। কোনো মতে স্টিভেন্সকে টেনে ঘোড়ার গাড়িতে তুলে গাড়ি ছুটিয়ে দিলেন ব্যারনেট। "এরকম কুকুর কখনো, দেখেছ, স্টিভেন্স?" "না, স্যার। দেখতে চাইও না।" স্টিভেন্সের উত্তর "ওর কোমরটা সম্পূর্ণ ভাঙা, পিছনের পা দুটো ঝুলছে। কিন্তু ছুটছিল কেমন করে?"

আধ ঘণ্টার মধ্যে তাঁরা পৌঁছলেন একটা সরাইখানায়। সরাইখানার মালিক ছিল ব্যারনেটের পূর্বপরিচিত। গরম জল, সুশ্রূষা, খাওয়াদাওয়া, চিকিৎসা সব ব্যবস্থাই হল। তারপর ব্যান্ডির গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে সে বলল "জবর লড়াই হয়েছে দেখছি। তা সেই ব্রোকাস হলের গুণ্ডার সঙ্গে নয়তো, স্যার?" ব্যারনেট বললেন "হয় তো তাই। তা আমাকে ব্যাপারটা একটু খুলে বলো তো দেখি!"

JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register

সরাইখানার মালিক বলল, "বলছি স্যার। তবে ওর হাতে জেম অ্যান্ড্রুজ আর বিল মেডোজ প্রায় খুন হয়েছিল, আর দুজন তো মারাই গেছে। ঘটনাটা কী ব্রোকাস কোর্টের সামনে হয়েছিল, স্যার?" ব্যারনেট সম্মতি জানানোতে সে বেশ উত্তেজিত হয়ে বলল "ঠিক ওখানেই স্যার, বিখ্যাত বক্সার টম হিকম্যান আর তার বন্ধু জো রো মারা যায় একটা গাড়ির দুর্ঘটনায়। সে স্যার ১৮২২ সালের কথা।"

নামটা শুনেই ক্যারনেট আর স্টিভেন্স মুখ চাওয়াচাওয়ি করে বলে উঠলেন "হিকম্যান, যাকে গ্যাসম্যান বলা হত সেই?" সরাইখানার মালিক বলল "হ্যাঁ, স্যার, ওকে সবাই গ্যাস বলে ডাকত। কেউ ওকে হারাতে পারে নি স্যার। শুধু একবার নীট, যাকে 'ব্রিষ্টল বুল' বলা হত ওকে নট আউট করে দেয়। সেই থেকে ওর নাম শুনলেই খেপে উঠত।....আচ্ছা, স্যার, এ কথা কী ঠিক যে ওরা আমাদের ঠাকুর্দার আমলের সাজপোশাক পরে আছে?" ব্যারনেট বললেন "তা ঠিক বলতে পারি না। তবে খুবই পুরোনো অদ্ভুত ধরণের পোশাক আর ওর মাতাটা....."।

ওঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মালিক বলল "এই সরাইখানায় এরা এসেছিল, স্যার। সেদিন বোধহয় কোনো লড়াইয়ে বড় বাজি জিতেছিল। খুব মদ খেয়েছিল। তারপর ঐ ব্রোকাস কোর্টের সামনে ঘোড়ার গাড়ি উল্টে দুজনেই মারা যায়। হিকম্যানের কপালের উপর দিয়ে ঘোড়ার গাড়ির ভারি চাটাকা চলে যায়, ওখানে দগদগে ঘা হয়ে গেছিল। এসব কথা স্যার বুড়ো জমিদারমশাইয়ের কাছে শুনেছি।....আর একটা কথা, স্যার। এই সরাইখানায় একটা কুকুর ছিল। ছোট টেরিয়ার কুকুর। মদ খেলে স্যার হিকম্যানের হুঁশ থাকত না। ঐ ফায়ারপ্লেসের পোকার-টা [illegible] দিয়ে এক ঘা দিতেই বেচারা কোমর ভেঙে মারা যায়। লোকজনে বলাবলি করে যে কুকুরটারেও রাতে [illegible]"

স্টিভেন্সের মুখ তখন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। কেবল অস্ফুটে বলল "যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। একটু খোলা বাতাস চাই"। সরাইখানার মালিক বলল "এখন, ভয় কী হে! তুমি তো বাহাদুর ছোকরা। হিকম্যানের সঙ্গে সারা রাত লড়াই করেও টসকাও নি। ওকে দু-চার ঘা দিয়েছ শুনলে এ অঞ্চলে অনেকে আনন্দ পাবে।" স্টিভেন্স বলল, "তা হোক, স্যার। আপাতত আমাকে লণ্ডনে ফিরে একটু শরীরটা মেরামত করে নিতে দিন। হপ্তা দুয়েক বাদে আবার আসব আপনার ঐ বার্টনের মোকাবিলা করতে। [illegible] লড়তে ভয় পাই না, স্যার। তবে এবার থেকে যাতায়াত করব ট্রেনে। ও পথ ঘোড়ার গাড়িতে আর নয়!"

ছবি : সুদীপ্ত দত্ত

JADAVPUR UNIVERSITY
Kolkata-700 032, India, Phone : 473-4044

ENGLISH
1. W.B. Yeats : An Indian Approach (1968)–Dr. Naresh Guha Rs. 15.00
2. Shakespeare's Treatment of his sources in the Comedies (1971)–Dr. D.C. Biswas Rs. 20.00

BENGALI
1. Kadambari O Gadyasahitya Silpabichar (1968)–Dr. Hrishikesh Basu Rs. 25.00 কাদম্বরী ও গদ্যসাহিত্যে শিল্পবিচার (১৯৬৮)—ডঃ হৃষীকেশ বসু।
2. রোমান্টিক ইয়ুথের [illegible]—ডঃ নারায়ণ মুখার্জী Rs. 20.00

PHILOSOPHY
1. Research Bulletin of Philsophy (1984) Special issue–Editor Dr. S. K. Bhattacharya. Rs. 20.00

LIBRARY & INFORMATION SCIENCE
1. Librarian Organ of the Department of Library and Information Science, Jadavpur

SANSKRIT
1. Tattasandarbha by Srijiva Gosvamin (1967)–Edited Dr. Sitanath Goswami Rs. 6.00
2. Bhagabatsandarbha by Srijiva Gosvamin (1972)–Edited Dr. Chinmayi Chatterjee Rs. 10.00

HISTORY
1. Journal of History Vol. VII (1986-87)–Edited Dr. Chittabrata Palit. Rs. 25.00

ECONOMICS
1. Economic Theory, Policy and Estimation (1972)–Dept. of Economics, J.U. Rs. 15.00

GEOLOGY
1. [illegible] mineralisation of the Singhbhum Copper-uranium belt, Eastern India (1984)–Dr. Keshab Sarkar. Rs. 220.00

MATHEMATICS
1. Trailing Edge Lift Distribution of Small Aspect Ratio Wings (1979)–Prof. Pradip Niyogi. Rs. 16.00
2. Some Fact of Ecodevelopment (1982) Edited Prof. D. K. Sinha. Rs. 25.00

ENGINEERING
1. Principles of Power Project Planning (1973)–Manoranjan Dutta. Rs. 25.00

BOOKS ARE AVAILABLE AT THE JADAVPUR UNIVERSITY PRESS AND GRANTHALOK, NATIONAL COUNCIL OF EDUCATION, CALCUTTA 700 032

JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register

ধাধাধা

শ্যামলকান্তি দাশ

ধাধাধা ধামা ধামা
ধাধাধা ধামা ধামা
এবারে ঠিক সুরে
গাও তো ছোটমামা।

ধাধাধা ধাঁই ধাঁই
ধাধাধা ধাঁই ধাঁই
আস্তে ধীরে গাও
কোরো না হাঁইফাঁই।

ধাধাধা কিটি কিটি
ধাধাধা কিটি কিটি
সুরের ভুল নিয়ে
অযথা খিটিমিটি।

ধাধাধা ধারে ধারে
ধাধাধা ধারে ধারে
সুরের কালোয়াতি
মামা কী ভালো পারে।

ধাধাধা ধামি ধামি
ধাধাধা ধামি ধামি
গাইলে সুরে ঠিক
রাগে না ছোটমামি।

ধাধাধা ধাক্ ধাক্
ধাধাধা ধাক্ ধাক্
এবার ক্ষ্যামা দাও—
গানেরা ছুটি পাক।

ফুল-কথা

সায়ন্তনী নাগ

মুলুক গ্রামে দেখতে পেলাম
শালুক ফুলের রাশি
ঝিলের জলে আকাশ দোলে
[illegible]।

ভুবনডাঙার মাঠ ছাড়িয়ে
যেই ফেলেছি শ্বাস
অমনি দেখি গালচে পাতে
তুলট সাদা কাশ।

রাঙা ধুলোর পথ পেরিয়ে
এসেছি বোলপুরে
[illegible] আঁচল বিছিয়ে রাখে
করবি উঠোন জুড়ে।

দিনের শেষে ক্লান্ত পায়ে
বাড়ির দিকে ঘুরি
দেখি খোয়াই ছাপিয়ে আছে
লক্ষ সোনাঝুরি।

টুনটুনি

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোট্ট পাখি টুনি—
কাটছিলো দিন হিজল-ডালে
নিজেরই তাঁত বুনি।
বর্গী এলো দেশে—
পুড়লো হিজল, উড়লো টুনি
বৈরাগীদের বেশে।

ছোট্ট দুটি ডানা—
ভর দিয়ে তাই পেরিয়ে চলে
পল্লী নগর নানা।

বছর দশেক পরে
টুনিকে আর যায় না চেনা
ফিরলো যখন ঘরে।

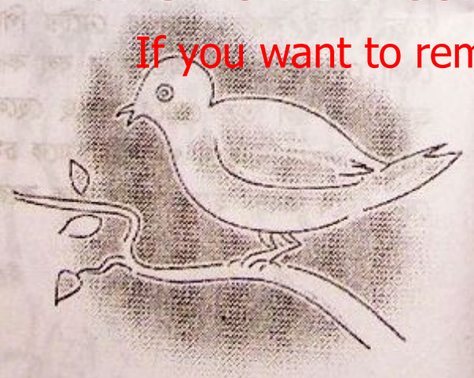

ছবি : সমীর দাশ

দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

কুচবিহার জেলায় ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে ধবলা নামে একটা ছোট্ট নদী আছে। তার দক্ষিণ দিকে চণ্ডীর হাট গ্রাম। এক সময় বিরাট হাট বসত। লোকে বলত, "যা নাই চণ্ডীর হাটে, সে না পাইবা রাইজ্যপাটে।" ধবলার জল দেখা যেত না হাটের দিনে। এত নৌকার ভিড়!

দেশ স্বাধীন হবার পর চণ্ডীর হাট পড়ল পাকিস্তানের ভাগে। একদিন হাটবারে গাড়ি, বন্দুক নিয়ে খানেরা এসে মেরে ধরে লুটপাট করে হাট ভেঙে মাঠ করে দিল। অনেক লোক মরেছিল সেদিন।

অতদিনের হাট, একদিনে বন্ধ হয়ে গেল। সে জায়গায় এখন খান সেনাদের বিরাট ঘাঁটি, এলাকার লোকে বলে, খানের ঘর।

নদীর উত্তর দিকটা ভারতের এলাকা। সেখানেও,

JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register

নদীর পার ঘেঁষে ফকিরবাড়ি নামে একটুকরো পাকিস্তানী ছিটমহল আছে। তার ঠিক পেছনেই বেনাঢালি নামের একটা গঞ্জমতো এলাকায় ভারতের সেনাছাউনি। তার ঠিক পাশে ফকিরবাড়িতে বাংলাদেশি মুক্তিবাহিনীর বেশ বড় একটা ঘাঁটি ছিল।

শরত টিকটিকি ওরফে শরত চাটুজ্যের আদি বাড়ি [illegible]কায়। দেশভাগের পর থেকে তার পরিবার ভারতের [illegible]ত্তর বাংলার বাসিন্দা। গ্র্যাজুয়েশানের পর ভারতীয় সেনাবাহিনীতে অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টোরকিপার হয়ে জয়েন করেছিল। পোস্টিং ছিল জলন্ধরে। সেখান থেকে অনেক ধরা করা করে নাকি বাড়ির কাছে পোস্টিং নিয়েছে। ছোটখাট রোগাভোগা চেহারা। কাজেও খুব একটা আহামরি কিছু নয়। ওই কোনও মতে চালিয়ে নিত এই যা। দোষের মধ্যে মাঝে মাঝেই দু'দিন, চারদিনের ফ্রেঞ্চ লিভ নিয়ে ডুব দেওয়া। তবে, ছাউনির এক বাঙালি কর্নেলের সঙ্গে বেশ দহরম মহরম ছিল, তাই তাকে কেউ কিছু বলত না।

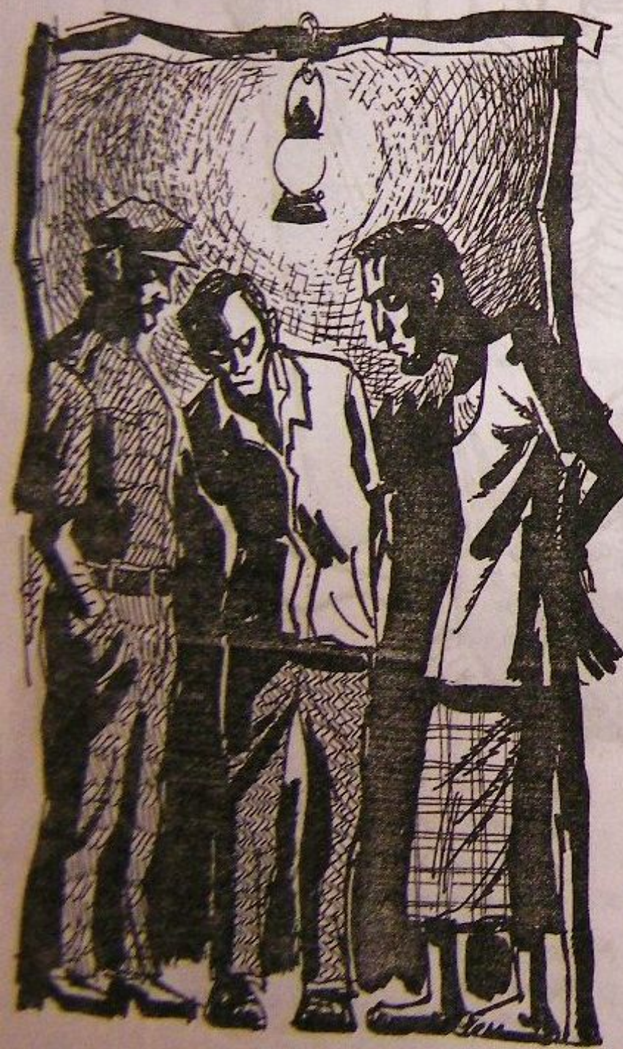

গোটা ছাউনিতে মোটামুটি এই ছিল [illegible]র প্রোফাইল। কিন্তু ভেতরের ব্যাপারটা অবশ্য ছিল একেবারে আলাদা। সেটা জানতেন গোটা সেনাছাউনির মাত্রই দুতিনজন অফিসার। আর জানতেন ফকিরবাড়ির বাঙালী মুক্তিবাহিনীর নেতারা। ভারতীয় গোয়েন্দাদফতরের উচ্চপদস্থ এই কর্মচারীটির বেনাঢালিতে পোস্টিং হয়েছিল, চণ্ডীর হাটের খানের ঘরে [illegible] পদমর্যাদার কর্মচারীদের এত ছোট জায়গায় ফিল্ডওয়ার্কে আসবার কথা নয়। কিন্তু, [illegible] চণ্ডীর হাটের মিলিটারি বেস, কৌশলগত কারণে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হয়ে উঠেছিল। এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, ভারতীয় চররা তখন ওর ভেতরে ঢোকবার জন্য যে কোন মূল্য দিতে রাজি। খবর ছিল, পুব বাংলার উত্তর সীমান্তের পাক লাইনের বেশ খানিকটা অংশ নিয়ন্ত্রণ করা হয় চণ্ডীর হাটে বসে। পাকিস্তানী সেনাঘাঁটিতে ঢোকবার পরপর কয়েকটা চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবার পর শরত নিজে এসে মিশনটার দায়িত্ব নেয় অ্যাসিট্যান্ট স্টোরকিপারের ছদ্মবেশে।

কিছুদিন যেতে দেখা গেল, কাজটা সত্যিই বেশ কঠিন। খানের ঘরের পাহারা বেশ [illegible] নেই। ঘুষ দিয়ে ও ছাউনির দু-একটা লোককে হাত করবার চেষ্টাও করে দেখল শরত। কিন্তু লাভ হল না কোনও। এমনি করে কয়েক মাস কাটবার পর যখন হাল ছেড়ে দেবার অবস্থা, তখন আচমকাই একটা সুযোগ এসে গেল তার সামনে।

দিন দুয়েক বাইরে ঘোরাফেরা সেরে সেদিন সন্ধের মুখ মুখ ছাউনিতে ফিরেছে শরত। হাত পা ধুয়ে থিতু হয়ে বসতে না বসতেই ফকিরবাড়ির মুক্তিবাহিনীর প্রধান বদরু কমান্ডারের হাতচিঠি নিয়ে এক ছোকরা এসে হাজির। মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে একবার ডেকে পাঠিয়েছে তাকে। কেন ডেকেছে [illegible] ছোকরাটা বলল,

"বদরু চাচায় বাঘ ধোরসে। আপনেরে দ্যাখাইবো কইয়া ডাকে।"

"বাঘ ধরেছে?"

"ওই হইলো গিয়া। বাঘু ডাকাইত আর জঙ্গলের বাঘ—একই বেপার।"

"বাঘু ডাকাত! ধরা পড়েছে!"

"হ। বদরু চাচায় ধোরসে।"

এই বাঘু ডাকাতকে কোনওদিন সামনাসামনি না দেখলেও শরত ওকে চিনত। ব্রিফিংয়ের সময় ছবি দেখেছে। ওর বাড়ি চণ্ডীর হাটে। লোকটা শুধু ডাকাতিই করে না। এই ডামাডোলের বাজারে এদিককার খবর খানের ঘরে বেচেও বেশ দু পয়সা কামিয়েছে। এর কাছ

থেকে ওদিককার কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে। অতএব বিশ্রাম টিশ্রাম শিকেয় তুলে শরত তাড়াতাড়ি পা চালাল।

বাঁশের খোঁটায় বেঁধে রাখা বাঘুকে অবশ্য মোটেই বাঘের মত দেখছিল না। রোগাভোগা চেহারার মানুষ। মার খেয়ে মাথা ফেটে গেছে। চুলের মধ্যে রক্ত। জুলজুল করে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।

শরতকে ঢুকতে দেখে বদরু উঠে এসে বলে, "পরশু [illegible] আমার বাড়ির পিছনে [illegible] করতে আছিল। বাগে পাইয়া ধোরসি হালারে।"

"তা এবারে কী করবে? পুলিশে দেবে?"

"নাঃ। তুমি কী জিগাইবা জিগাইয়া লও। কইতে চায় ভালো, সব শুইন্যা টুইন্যা গুলি করুম। আর না কইতে চাইলে অরে ধওলায় বিড়াল ডুবা ডুবামু।"

শরত এগিয়ে গিয়ে বাঘুকে জিজ্ঞাসা করল, "কী রে, ঘরে বিবি বাচ্চা আছে?"

"হ।"

"বদরুর কথা তো শুনলি। তোকে ওরা ছাড়বে না। এবারে [illegible]

"কি আর করবো। বাইচ্যা থাকলে ভিক্ষা কোরবো পথে পথে। তবে বাবু, অ্যাকখান কথা।"

"বল"।

"আমারে মাইরাই যদি ফ্যালান তা হইলে লাশডা গুম্ কইরেন না। চণ্ডীর হাটে পাঠাইয়া দিয়েন।"

এবারে বদরুরও কৌতুহল হল। বলে, "কেন?"

"কাইল আমি ফকিরবাড়ি আইসি, খানে হেই খবর জানে। লাশ গুম্ কোরলে ভাববো আমি পলাইয়া গিয়া ইন্ডিয়ার লগে যোগ দিসি। তা হইলে আমার বিবি বাচ্চারে বড় কষ্ট দিয়া মারবো।"

শরতের মাথায় একটা ফন্দি গজিয়ে উঠছিল। আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বদরুকে সে নিজের প্ল্যানটা বলল। দুঃসাহসিক পরিকল্পনা। কিন্তু শত্রুশিবিরের ভেতরে [illegible] ঝুঁকি নিতে রাজি। খানিক ইতস্ততঃ করে বদরু রাজি হয়ে গেল অবশেষে। ডাকাবুকো লোক। শরতের প্রস্তাবটা তারও মনে ধরেছে।

শলাপরামর্শ সেরে শরত আবার ফিরে এল এপাশে। বাঘুর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'শোন বাঘু। তুই আর তোর পরিবার দু-ই বাঁচবে তার একটা রাস্তা বলতে পারি। কিন্তু তুই কি তাতে রাজি হবি?"

"আমার বিবি বাচ্চা বাঁচবো?"

"হ্যাঁ।"

"তা হইলে আপনে যা কইবেন তাইতেই জান কবুল।"

"তোকে আমাদের হয়ে কিছু কাজ করতে হবে। একনম্বর হল, খানের ঘরের খবর কিছু কিছু আমাদের চাই।"

"কিন্তু আমারে তো বাবু ভিতরেই ঢুকতে দেয় না। সময়ে সময়ে দরজার কাছে যাই। দরজা খুইল্যা সামনেই একটা ঘরে বসায়, একজন সায়েবে আইসা যা শুনবার শুনে, যা কইবার কয়, টাকা পয়সা দেয়, বাস।"

"ঠিক আছে। তাহলে আমাকে খানের ঘরে ঢোকবার একটা উপায় করে দিতে হবে।"

বাঘু শরতের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "কবুল। তবে হেই কামের আগে আমার বিবি বাচ্চার এই পারে নিয়া আসবার ব্যাবস্থা করার লাগবো সাহেব।"

শরতও মনে মনে তা-ই চাইছিল। যে মিশনে চলেছে, তাতে এই লোকটা কখনো যদি ডাবল ক্রসিং করে তবে তাতে তার প্রাণ যেতে পারে। কাজেই, ওর পরিবার যদি ভারতীয় সেনাবাহিনীর আওতায় থাকে, তাহলে নিরাপদে যেমন থাকবে, তেমনি জামিনেরও কাজ করবে।

মনের ভাবটা প্রকাশ না করে যে মুখে বলল, "হয়ে যাবে। বদরু কমান্ডার সে বন্দোবস্ত করে দেবে। তোর

JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register

বউ বাচ্চা নিরাপদে পৌঁছোবার পরই তুই আমার কাজে হাত দিবি বাঘু। তার আগে নয়।"

২

এর দিন সাতেক পর চণ্ডীর হাটে বাঘুর বাড়িতে ডাকাত পড়ল। বাড়িটা গ্রামের একেবারে একধারে। পাশেই নদী। বাঘু বাড়ি ছিল না। তার বউ বাচ্চার চিৎকার শুনেও গ্রামের লোক ঘর ছেড়ে বেরোবার সাহস পায়নি। মিনিট কুড়ি পরে ডাকাতরা কাজ সেরে চলে গিয়েছিল ঘরে আগুন লাগিয়ে। তারপর লোকজন সাহস করে বাইরে বেরিয়ে দেখে নদীর পারে খানিকটা জায়গা জুড়ে রক্তে একেবারে মাখামাখি। খানিক রক্ত ঢাল গড়িয়ে নীচে গিয়ে পড়েছে। বাঘুর বৌ বাচ্চার কোনও চিহ্ন নেই।

অপরেশনটা আসলে বদরু আর তার দলের কয়েকটা ছেলে মিলে করেছিল। বাঘুর বৌ আর বাচ্চাকে আগে থেকে কিছু জানানো হয়নি। ফলে হঠাৎ করে ওদের আসতে দেখে তারা ভয়ে ডাকাত ডাকাত বলে চিৎকারও করেছিল খুব। ওরাও তাই চাইছিলো। গ্রামের মানুষ যাতে মনে করে ডাকাতই পড়েছে বাঘুর ঘরে। একটু মারধরও করেছিল দু'জনকে, যাতে জোরে জোরে চিৎকার করে।

মিনিট দশেক শোরগোল করে তারপর ওদের দুজনকেই ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে নদীর ধারে বয়ে নিয়ে আসে বদরুরা। বাড়িটাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। তারপর কয়েকটা মুরগী কেটে রক্তটা নদীর ধারে ছড়িয়ে দিয়ে ওরা নৌকোয় চেপে বাঘুর বৌ ছেলেকে নিয়ে বেনাঢালিতে ফিরে এল। ঘন্টাকয়েক পরে ডাকাতের খোঁজে খানসেনারা যখন গোটা এলাকা তোলপাড় করছে, ততক্ষণে বাঘু, তার বৌ আর ছেলেকে নিয়ে ভারতীয় সেনার জিপে চড়ে শিলিগুড়ির আর্মি ক্যাম্পের দিকে চলেছে। ওখানেই তাদের রাখা হবে।

ডাকাতির দিন তিনেক পর বাঘু বাড়ি ফিরল। সঙ্গে করে দূরসম্পর্কের এক ভাইপোকে নিয়ে এসেছে। বেচারা ইন্ডিয়াতে থেকে না খেয়ে মরছিল নাকি। এখানে বাঘুর ঘরে দু'বেলা যা হোক দুমুঠো খাবার জুটে যাবে।

নিজের পোড়া বাড়িটার সামনে এসে বাঘু বেশ কিছুক্ষণ আছাড়ি পিছাড়ি করে কাঁদল বউ বাচ্চার নাম ধরে ডেকে ডেকে। কাঁদে আর ভগবানের নামে কিরে খায়, খুনিদের সে খুঁজে বার করে সাজা দেবেই। তারপর পাড়ার কারুর সঙ্গে কোনও কথা না বলে ভাইপোর হাত ধরে সোজা গিয়ে উঠল খানের ঘরে। ঝাড়ুদারদের সর্দার হামিদের সাথে বাঘুর বেশ ভাব। তার কাছেই যাবে। এমন দুঃসময়ে ওই তার একমাত্র আশ্রয়।

বাঘুর ভাইপোর নাম ফয়জল। বয়স বেশি নয়। বাপ মা ইন্ডিয়াতে মারা গেছে কিছুদিন আগে। তার ওপর এখানে এসে এমন একটা ভয়ানক ঘটনা দেখে কেমন যেন হাবা বনে গেছে ছেলেটা। বড় বড় চোখ করে চেয়ে থাকে শুধু। কথা বললে সাড়াটাড়া বিশেষ দেয় না।

ঝাড়ুদারদের কোয়ার্টারে পৌঁছে আরেক প্রস্থ কান্নাকাটি হল বাঘুর। এখানে [illegible] 'আহা উহু' করে বাকি লোকজন যার যার কাজে ফিরে গেলে, ফয়জলকে দেখিয়ে হামিদকে বাঘু বলল, "কইরা পোলাডারে সঙ্গে কইরা এই দ্যাশে আনলাম, আইসা তো দেখি আমার নিজেরই কপাল পুড়সে। এখন এরে লইয়া কী করি বলেন ভাইজান? কে-ই বা রাখে, কে-ই বা দেখে। ওই তো হাবাগোবা ছাওয়াল। আপনি খানের ঘরে এর একখান গতি কইরা দেন।" তাই শুনে ছেলেটা এমন করুণ চোখ করে তার দিকে তাকিয়ে রইল যে হামিদের তাতেই মন গলে গেল।

অতএব খনিক পরে বাঘু ছাউনি ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল। একা। ফয়জলের কাজ জুটে গেছে খানের ঘরে। ঝাড়ু দেবার কাজ।

এর দিন দশেক পরে [illegible] ছাউনিতে এসেছিল কিছু খবর নিয়ে। সায়েবের সঙ্গে কাজের কথাবার্তা সারা হতে ফয়জল এল তার কাছে। এক ঘন্টার ছুটি পেয়েছে কাকার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে।

ছাউনির সীমা ছাড়িয়ে নদীর ধারে এসে বিড়ি ধরাল দুজনে। সারাদিন গুমোট মেরে ছিল, এখন সন্ধের মুখে হু হু করে জোলো হাওয়া ছাড়ছে। ত্রিসীমানায় কোনও লোকজন দেখা যায় না। তবুও একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিয়ে তারপর দুজনেই যার যার গলার থেকে দুটো তাবিজ খুলে আনল। সাধারণ পীরের তাবিজ। আপাতদৃষ্টিতে [illegible] না। দুটোই হুবহু এক রকম দেখতে। একইরকম কালো সুতো দিয়ে বাঁধা। নিঃশব্দে [illegible] গেল। ফয়জলের তাবিজটা নিজের গলায় বেঁধে নিয়ে তার হতে মৃদু চাপ দিয়ে বাঘু বলল, "আসি শরত ভাইজান। আবার পরের পরের রবিবার দেখা হইবো। মেজর ঘোষ কইসে, আর একখান ঝুটা খবর বানাইয়া দিবো খানেরে দেওনের লাইগ্যা। হেই লইয়া আসুম। বিকালের দিকে।" শরতও ততক্ষণে বাঘুর তাবিজটা নিজের গলায় পরে নিয়েছে। নীরবে সম্মতি জানিয়ে সে ছাউনির পথ ধরলো।

মজদুর বস্তিতে নিজের কোয়ার্টারে ফিরে ঘরের দরজা বন্ধ করে তাবিজটা খুলে ফেলল শরত। ছোট্ট একটা চিরকুট ভেতরে। কয়েকটা আঁকিবুঁকি কাটা আছে তাতে। সাংকেতিক ভাষায় কিছু নির্দেশ। সেগুলো কণ্ঠস্থ করে নিয়ে গুলি পাকিয়ে কাগজটা মুখে দিয়ে এক গ্লাস জল খেল শরত।

দেখতে দেখতে একটা বছর কেটে গেল। এই এক [illegible] ঝাড়ুদারদের কোয়ার্টারে। এদের সঙ্গে মিশে নেই হয়ে থাকাটাই তার [illegible] ঝাড়ুদারের মতই অশিক্ষিত বাচনভঙ্গী, মদ খাওয়া, সবই অভ্যাস করতে হয়েছে একে একে। ঝাড়ুদারের সব ঘরেই অবাধ গতি। ঝাঁট দিতে দিতে তার অবোধ চোখগুলো ছাউনির সবকিছুই দেখে। বাংলা ছাড়া আর কোনও ভাষা সে জানে বলে কোনদিনও কেউ সন্দেহ করেনি। অতএব নিরীহ ঝাড়ুদারটির সামনে নিশ্চিন্তে চোস্ত উর্দুতে গল্প করে খান সেনারা। ঝাড়ু দিতে দিতে সেই সবকিছুই কানে যায় তার। তারপর সপ্তাহান্তে তাবিজের মধ্যে করে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাচার হয়ে যায় ছাউনির বাইরে। গল্পের গুপ্তচর বা গোয়েন্দাদের [illegible] ছদ্মবেশ, কিছুই তার নেই। একমাত্র অস্ত্র ওই পীরের তাবিজ, আর একমাত্র ছদ্মবেশ ওই ঝাঁটাটা। নিজের গুমটিঘরের এককোণে ঠেস দিয়ে রাখা ঝাঁটাটার দিকে মাঝেমাঝে চেয়ে দেখে শরত। ঝাঁটাধারী গোয়েন্দার গল্প কি কেউ কখনো বিশ্বাস করবে!

৩

১৯৭১-এর শেষদিক। ভারতের পূর্ব পশ্চিম দুই সীমান্তেই যুদ্ধ ঘনিয়ে এসেছে। পূর্ব সীমান্তে ভারতীয় সেনা আর বাঙালী মুক্তিবাহিনী তৈরি হচ্ছে খান সেনাদের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়ার জন্য। বাইশে নভেম্বর পশ্চিমবাংলার আকাশে আকস্মিক বিমান হানা চালাল চারটে পাকিস্তানী স্যাবার জেট বম্বার। ভারতীয়রাও তৈরি ছিল। আকাশে মুখোমুখি লড়াই করে তিনটে হানাদার বিমানকে ধ্বংস করে দেয় ভারতীয় ন্যাট জঙ্গী বিমান। বোঝা যাচ্ছিল, আসল বোঝাপড়ার দিন আসছে।

সেটা ছিল দোসরা ডিসেম্বর। বেশ কিছুদিন ধরেই বাঘুর কোনও খবর ছিল না। সেদিন বিকেলে শরত সবে ঘরে এসে ঢুকেছে, তখন হামিদ এসে খবর দিল, বাঘু এসেছিল। কিন্তু আর ফিরে যায়নি। হামিদের সঙ্গে কথা বলছিল, এমন সময় দুজন জওয়ান এসে ওকে ধরে নিয়ে গেছে ছাউনির ভেতরে। নিয়ে যেতে যেতেই খুব মারধোর করছিল।

শরত সতর্ক হল..."আল্লা রে আল্লা। ক্যান, চাচাজানের কসুরডা কী?"

"তার আমি কি জানি। খানের মাইর খাইতে কি কসুর করন লাগে? তবে নিয়া যাইতে যাইতে কইতাসিল, হালায় নাকি ভারতের স্পাই। ভুলভাল খবর দিয়া খানের নুকসান করছে।"

শরত উদাস চোখে খানিকক্ষণ আকাশের দিকে চেয়ে রইল, তারপর বলল, "খুদায় অ্যার বিচার কোরবো। আমার চাচাজান খানের লাইগ্যা জান দিতে পারে! আর তার নামে কিনা এই কথা!"

হামিদ খবরটা দিয়ে ফিরে যাচ্ছিল। শরত খানিকটা নিরাসক্তভাবে পেছন থেকে একবার ডাক দিল, "চাচা, কয়দিন ধইরা প্যাটে একটা ব্যথা হয়। তা চাচা কইসিল, একটা তাবিজ আনাইয়া দিবো। কিছু আনছিল নাকি?"

হামিদ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "অই দ্যাখ, ভুইল্যা গেসলাম। খানের জওয়ান গালি দিতে দিতে আইতাসে এই দেইখ্যাই আমার কাছে তবিজডা দিয়ে দিয়া বাঘু কইছিল, তুমার হাতে দিয়া দিতে। এই লও।"

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে তাবিজটা খুলে ফেলল শরত। দু লাইনের ছোট চিঠি। চূড়ান্ত আক্রমণ শুরু হবার আগে পাকিস্তানী উত্তর বাংলায় সেনাবিন্যাসের ট্যাকটিকাল ম্যাপটা বের করে আনতে হবে। সময়সীমা পরদিন ভোর ছ'টা।

জানালা দিয়ে বাইরে পিলারের মাথায় বড় ঘড়িটা দেখা যাচ্ছিল। ঠিক বারো ঘন্টা সময় আছে হাতে। শরত খুব তাড়াতাড়ি চিন্তা করছিল। এইজাতের কাগজপত্রগুলো

JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register

স্ট্রংরুমে রাখা থাকে। তার কম্বিনেশান তালা ভাঙতে গেলে অন্তত দু ঘন্টা সময় লাগবে। সবার অলক্ষ্যে অতটা সময় স্ট্রংরুমে কাটানো সম্ভব নয়। আর সম্ভব হলেও, ম্যাপ. নিয়ে ছাউনি থেকে বের হবে কী করে?

একটা মাত্র ক্ষীণ সম্ভাবনা আছে। আজ সারাদিন ধরে স্ট্রংরুমের লাগোয়া কনফারেন্স রুমে মিটিং চলেছে। স্ট্রংরুম থেকে কাগজপত্রও নিয়ে যাওয়া হয়েছে বেশ কয়েকবার। ম্যাপটাও বের করে এনে থাকতে পারে। সেটাই স্বাভাবিক। এখন, ওখান থেকে যদি কোনওমতে....

ঘরের দরজা বন্ধ করে, খাটিয়াটা সরিয়ে এককোণের মাটি খুঁড়তে শুরু করল শরত। সামান্য একটু খুঁড়তেই একটা পুঁটুলি বের হল। শরতের অস্ত্রশালা। কিচেন থেকে চুরি করা একটা ভাঁজ করা ছ ইঞ্চি ছুরি। খানিকটা নাইলনের দড়ি। আর একটা কালো শিশি। পায়ে ব্যথার চিকিৎসা করতে গিয়ে ছাউনির হাসপাতাল থেকে সরিয়ে এনেছিল। ওতে ক্লোরোফর্ম আছে। [illegible] পেয়ে গিয়ে তুলে এনেছিল। ভাবেনি কখনও কাজে লেগে যাবে।

সারাদিন ধরে জোর ব্যস্ততা চলেছে ছাউনি জুড়ে। খবর এসেছে, যে কোনও মুহূর্তে আক্রমণের আদেশ আসতে পারে, অথবা অ্যাডভান্সমেন্ট শুরু করতে পারে ভারতীয় বাহিনী। সন্ধে থেকেই পুরো ক্যাম্প বিমানহানার ভয়ে নিষ্প্রদীপ।

রাত [illegible] কনফারেন্স রুমের যে পাশে স্ট্রং রুম তার উল্টোপাশেই ছাউনির কন্ট্রোল রুম। তার দরজার একপাশে অন্ধকারের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে শরত একবার উঁকি মারল ভেতরে। সেখানে দু-জন রেডিও অফিসার যন্ত্রপাতি নিয়ে বসে কাজ করছে। বেতারে খবর আসছে দফায় দফায়। একজন সাংকেতিক [illegible] নিচ্ছে কোডের বই খুলে। আর, [illegible] পর্দায় চোখ রেখে অন্যজন ধ্যানস্থ।

দু'জন লোক একসঙ্গে ওখানে থাকলে কাজ হবে না শরতের। অতএব অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। ঝাঁটাটা পায়ের কাছে রেখে ও বসে রইল সেখানে।

প্রায় ঘন্টাখানেক পরে ভেতর থেকে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। একজন বাইরে আসছে। শরত অন্ধকারের মধ্যে মিশে গিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে রইল। একজন রেডিও অফিসার হাতে কি একটা কাগজ নিয়ে ব্যস্তসমস্ত ভাবে কনফারেন্স রুমের দিকে ছুটছে। কনট্রোল রুমের দরজটা খোলা। শরত হাতে ধরা ন্যাকড়ার টুকরোটা ক্লোরোফর্মে ভিজিয়ে নিল।

[illegible] হয়নি। টেবিলে মাথা নিচু করে কাজে ব্যস্ত রেডিও অফিসারের নাকে ন্যাকড়াটা চেপে ধরতে, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে লোকটা এলিয়ে গেল। তারপর, তার একপাশে কন্ট্রোল প্যানেলের পায়ে আটকানো বিমানহানার সাইরেনের সুইচটা টিপে দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে দিল শরত। এবারে আসল কাজ।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ একটা শব্দে রাতের নিস্তব্ধ আকাশ ফালা ফালা হয়ে গেল। সাইরেন বাজছে। তার মানে ওরা আসছে। রাতের আকাশে অতর্কিত বিমান হানায় উড়ে আসছে ভারতীয়, বিমান বহর। মুহূর্তে জীবন্ত হয়ে উঠল গোটা ছাউনি। কনফারেন্স রুমের দরজা খুলে অফিসাররা ছুটছে যে যার পোজিশনে। [illegible] এয়ারক্রাফ্ট [illegible] আকাশমুখো।

গন্ডগোলের মধ্যে কেউ খেয়াল করেনি, ছোট্টখাট্টো একটা লোক অন্ধকারে মিশে কখন যেন ঢুকে গেছে কনফারেন্স রুমের ভেতরে। তার শিক্ষিত চোখ টেবিলের ওপর ছড়িয়ে থাকা কাগজপত্রগুলোর মধ্যে থেকে ট্যাকটিকাল ম্যাপটাকে চিনে নিতে কয়েক সেকেন্ড সময় নিল। তারপর এক ফুঁয়ে টেবিলের ওপর জ্বলতে থাকা মোমবাতিটা নিভিয়ে দিল সে।

অন্ধকারের মধ্যে ক্ষীপ্র হাতে শরত কাজ সারছিল। সাইরেনের ফাঁকিটা ধরা পড়তে বেশি সময় লেগে না। অতএব অল্প সময়ের মধ্যে কাজ সারতে হবে। ঝাঁটার মধ্যে গোঁজা মোটা কঠিটা একটানে খুলে ফেলেছে সে ততক্ষণে। এবারে ম্যাপের দুপাশের [illegible] সরু লাঠি দুটোকে একত্র করে গোটা ম্যাপটাকে তার ওপর পাকিয়ে একটা মোটা কাঠির মত বানিয়ে নিয়ে ঝাঁটার মধ্যে গুঁজে দিল ভাল করে। তারপর ঝাঁটা বগলে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ধবলার ধারে নৌকো নিয়ে বদরু অপেক্ষা করছিল। একটা ছোট্ট ধাক্কা দিয়ে নৌকোটা জলে ভাসিয়ে দিয়ে লাফ দিয়ে তাতে চড়ে বসল শরত। তারপর ঝাঁটাটা পায়ের কাছে রেখে দুটো বৈঠা তুলে নিল দুহাতে। বদরু আর শরতের চারটে বৈঠার ধাক্কায় তীরের মত সামনে ছুটে গেল ছিপ নৌকো। দূরে, খানের বাড়িতে তখন সবক'টা সার্চলাইট একসাথে জ্বলে উঠেছে। তার মানে নকল সাইরেনের ফাঁকিটা ধরা পড়ে গেছে এবারে। রাত্রির নৈঃশব্দকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খাচ্ছে চারপাশে ছুটে বেরনো মিলিটারি জিপের ইঞ্জিনের শব্দ...

এর ঠিক চব্বিশ ঘন্টা বাদে, তেসরা ডিসেম্বর রাতে ভারত সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। আর, তার পরের ঘটনা তো ইতিহাস। উত্তরবঙ্গ সীমান্তে খানসেনাদের বিষদাঁত ভেঙে দিতে ভারতের সেনা আর বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের বেশি সময় লাগেনি।

সেই জয়ের পেছনে আমাদের শরত টিকটিকি, আর তার মত আরও কত নাম না জানা দুঃসাহসী মানুষের নিঃশব্দ অবদান রয়েছে কে জানে! *(কাল্পনিক)*

ছবি : অনিন্দ্য বসু

[illegible]র্তীর জন্ম শতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য

শৈল চক্রবর্তী অমনিবাস

শ্রীশৈলের আঁকা ও লেখা সমগ্র সংকলিত হয়েছে এই বইয়ে।

*ভূমিকা : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় * প্রচ্ছদ : গণেশ হালুই*

৫৪৪ পাতার বই দাম : ৫০০ টাকা

বইমেলায় পাবেন সন্দেশের স্টলে

মন্দাক্রাতা ৩০ কলেজ রো, কলকাতা-৭০০ ০০৯

মোবাইল : ৯৩৩০৮৩১৪৬৮

JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register